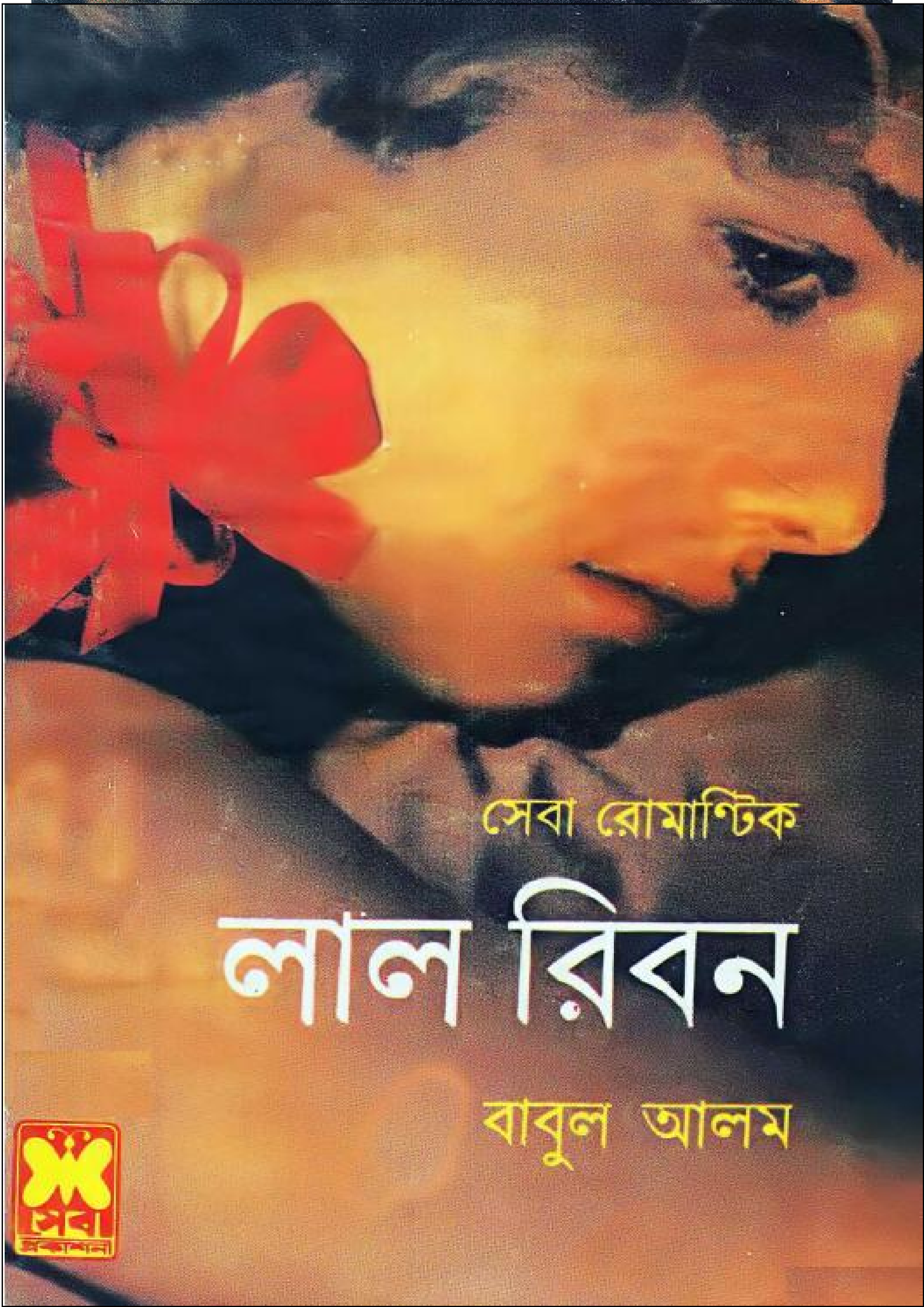
সেবা রোমান্টিক
লাল রিবন
বাবুল আলম
সেবা
প্রকাশনী

প্রারম্ভ

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রি। বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এক বিশাল শিল্প সাম্রাজ্য। কিন্তু পরিবারের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্য ছাড়া কেউ জানে না এ সাম্রাজ্যের উৎসে আছে একটি প্রেমের উপাখ্যান, একটি খুন ও একজন পুরুষের বড় হবার দুর্দান্ত জেদ।

আঠারশ পঞ্চান্ন সাল। পোলাণ্ডের ক্রাকোভ শহর। সারাদেশে তখন চলছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ক্যাম্পে ক্যাম্পে আটক করে রাখা হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের।

ক্রাকোভ শহরের উপকণ্ঠে এমনি এক ক্যাম্পের ছোট্ট একটা কাঠের ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে আছে বাশেভিস মেয়ার। বয়স পাঁচ বছর। ক্যাম্পের চারদিকে পাঁচিল। বাইরে, রাস্তার ওপর, সাম্প্রদায়িক পিশাচদের হাতে খুন হয়েছে ওর মা।

অনেকক্ষণ ধরে চলেলো দাঙ্গা। পুলিস আসার পর পালিয়ে গেল দাঙ্গাবাজরা। সরিয়ে ফেলা হলো লাশ। আস্তে আস্তে নিথর হয়ে পড়লো ক্যাম্প।

থেকে থেকে ভেসে আসছে আহতদের গোঙানি। চোরের মতো চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো বাশেভিস। মাকে খুঁজছে ও। চারপাশে গোটা ক্যাম্প তখন জ্বলছে। কাঠের বাড়ির স্ফুলিঙ্গে আকাশ লাল। বাতাসে ঝুলছে কালো ধোঁয়ার পুরু মেঘ।

মানুষ পাগলের মতো খুঁজছে নিজেদের আত্মীয়স্বজন। বাঁচাতে চাইছে বাড়িঘর, দোকানপাট।

সবখানে মৃত্যু। লাশ, জখম হওয়া মানুষের বিকৃত শরীর। ধর্ষিতা মহিলা। নগ্নতা। রক্ত। আর্তনাদ।

খুঁজতে খুঁজতে মা-র দেখা পেলো বাশেভিস। রাস্তায় পড়ে আছে; অর্ধচেতন, নগ্ন, রক্তে ঢাকা পড়েছে মুখ। কাঁদতে কাঁদতে মা-র পাশে বসে কানের কাছে মুখ নামিয়ে বাশেভিস ডাকলো, 'মা।'

চোখ খুলে ছেলেকে দেখে কথা বলতে চাইলো মা, পারলো না। বাশেভিস বুঝতে পারছে মারা যাবে ওর মা। ওর অবুঝ শিশুমন তবু বাঁচাতে চাইছে মা-কে, কিন্তু কেমন করে তা ও জানে না। ওর কোমল হাত দুটো পরিষ্কার করতে লাগলো মা-র রক্তাক্ত মুখ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মরে গেল মা।

পরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাশেভিস দেখলো, একটা গর্ত খুঁড়ে মা-র পিঠের নিচের মটিসহ কবর দিলো মা-কে কবরখননকারীর দল। মা-কে বাঁচাতে না পারার বেদনায় ও সিদ্ধান্ত নিলো, 'ডাক্তার হতে হবে।'

তিন ঘরের ছোট্ট একটা কাঠের বাড়িতে আরো দুটো পরিবারের সঙ্গে থাকে বাশেভিস-রা। প্রত্যেক পরিবারের জন্যে একটা করে ঘর বরাদ্দ করেছে কর্তৃপক্ষ। বাশেভিসের কোনো ভাইবোন নেই। ওদের ঘরে থাকে ওর এক খালা। জন্মের পর থেকে যে সব জিনিস সম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মায়নি ওর সেগুলো হচ্ছেঃ বিছানা, গোপনীয়তা, নির্জনতা আর নীরবতা।

বাশেভিসের বাবা ফেরিঅলা। ঠেলাগাড়িতে করে জিনিসপত্র ফেরি করেন ক্যাম্পের ভেতরে। বাবার সঙ্গে ঘুরতে খুব ভালো লাগে ওর। ভালো লাগে ভিড়, রাস্তা, পাকা ফল, বেকারী থেকে ভেসে আসা বিস্কুটের সুবাস, মাছ ভাজার ঘ্রাণ, ফেরিঅলাদের গান, গিন্নীদের দর কষাকষি।

ক্যাম্পের চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঢোকা এবং বের হবার দরজা একটাই। সূর্য ওঠার সময় খোলা হয় দরজা, আর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় কবাট, তখন ঝোলে বিশাল একটা লোহার তালা। দুজন সেন্ট্রি পালা করে পাহারা দেয়।

ক্যাম্পের বাসিন্দারা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে শহরে যায়, কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসে ওরা। দেরি করে কেউ ফিরলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। ক্যাম্পের মানুষ সরকারি চাকরি করতে পারে না।

বারো বছর বয়সে বাশেভিসকে শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন ওর বাবা। ক্যাম্পের ভয় জাগানো নিষিদ্ধ কাঠের দরজাটি দিয়ে বের হবার সময় এক অজানা উত্তেজনায় লাফাচ্ছিল ওর হৃৎপিণ্ড। আর শহরে ঢুকতেই অচেনা আনন্দে দাপাতে লাগলো মন। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, মানুষের চেহারা, কাপড়চোপড় এসব যে এতো সুন্দর হতে পারে তা কখনোই ভাবতে পারেনি ও। বাবার হাত ধরে সামনে এগোতে এগোতে বিস্ময়ে ভরে উঠছিল ওর অন্তর। স্বাধীনতার স্বাদ কখনো পায়নি ও, চোখে দেখেনি ফাঁকা জায়গা। অথচ আজ চোখের সামনে এ দুটোরই ছড়াছড়ি। রাস্তার পাশে প্রতিটি বাড়ির মাঝখানে অনেক ফাঁকা জায়গা, এবং প্রায় সবগুলো বাড়ির সামনেই একটা করে ছোট্ট বাগান। এখানকার মানুষগুলো নিশ্চয় সবাই লক্ষপতি, এই অনুভূতিটিই জাগলো বালক বাশেভিসের মনে।

দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে ফেরির মালপত্র কিনে ঠেলাগাড়ি ভর্তি হতেই শহর ছেড়ে আবার নোংরা ক্যাম্পের দিকে হাঁটতে লাগলো বাপ-বেটা। কিন্তু ফিরতে চাইছিল না অবুঝ বালকের হৃদয়।

'বাবা, আমরা আর কিছুক্ষণ এখানে থাকতে পারি না?' ভিখিরীর মতো অনুনয় করলো বাশেভিস।

'না, না, ও কথা মুখে আনবি না। রাত হচ্ছে। গেট বন্ধ হয়ে যাবে।'

সে রাতে কুঠরির মেঝেতে শুয়ে সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলো না বাশেভিস। মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠছে ক্রাকোভ শহর। ছবির মতো বাড়িগুলো। ফুল। সবুজ বাগান। 'কেন পাঁচিলের ওপারে আমার জন্ম হলো না? না, আমাকে এখান থেকে মুক্তি পেতেই হবে, খুঁজে বের করতে হবে একটা পথ।' আর তখনি ওর মনে পড়লো মা-র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ওর প্রতিজ্ঞার

কথাঃ 'ডাক্তার হবো।' এটাই এ নরক থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। নিজের অনুভূতিগুলো কাউকে বলতে চাইছিল ও, কিন্তু ওর আশেপাশে এমন কেউ নেই যাকে ও কথাগুলো বলতে পারে।

হাজার হাজার লোকে জনাকীর্ণ ক্যাম্পে সংক্রামক রোগ হরহামেশাই মহামারীর রূপ নেয়, অথচ মাত্র তিনজন ডাক্তারকে সরকারিভাবে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে যার পসার সবচেয়ে বেশি তাঁর নাম ডা. আইজাক সিঙ্গার। গরীব ক্যাম্পবাসীদের চোখে তাঁর বাড়ি রাজপ্রাসাদের মতো। তিনতলা, জানালায় ইস্ত্রিকরা নিভাঁজ লেসের পর্দা। ঘরের পালিশকরা আসবাবপত্রগুলো চকচক করে। কল্পনায় বাশেভিস দেখেঃ বাড়ির ভেতরে একটা ঘরে ডা. সিঙ্গার রোগীদের চিকিৎসা করছেন, ওষুধ লিখে দিচ্ছেন, শোনাচ্ছেন আশ্বাসের বাণী। অথচ ওই কাজগুলো ও নিজে করতে চায়। বাশেভিস জানে, ডা. সিঙ্গারের মতো কেউ একজন ওকে সাহায্য করলে ও ডাক্তার হতে পারবে। কিন্তু পাঁচিলের ওপারে সুন্দর ক্রাকোভ শহরটাতে পৌঁছুনো যেমন অসম্ভব তেমনি ডা. সিঙ্গারের কাছে পৌঁছুনোও অসম্ভব মনে হয় ওর কাছে।

মাঝেমাঝে রাস্তায় ডা. সিঙ্গারকে দেখতে পায় বাশেভিস। সহকর্মীদের সঙ্গে মগ্ন হয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছেন। এক ছুটে তাঁর পাশে যেতে চায় ও, শুনতে চায় ওই কীর্তিমান পুরুষের মহামূল্যবান কথা। কিন্তু দ্বিধা ভয় সংকোচ আটকে রাখে ওর পা দুটোকে।

একদিন, ওর স্বপ্নপুরী ডা. সিঙ্গারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো বাশেভিস, এমন সময় ওর চোখে পড়লো সামনের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসছেন ডাক্তার; সঙ্গে তাঁর মেয়ে, গোল্ডা সিঙ্গার। প্রায় ওর সমবয়সী। কিন্তু সুন্দর, আশ্চর্যরকম সুন্দর। এতো সুন্দর প্রাণী বাশেভিস আগে কখনো দেখেনি, ক্রাকোভ শহরেও না। গলায় লাল রিবন। গোল্ডার ওপর চোখ পড়ার মুহূর্তেই বাশেভিস ওর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলো ওই সুন্দরতম মেয়েটি ওর বৌ হতে যাচ্ছে। কেমন করে সেই অলৌকিক ঘটনাটি ও ঘটাবে সে সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; কিন্তু নিজেকে ও বোঝালো এটা পারতেই হবে ওকে।

সেদিনের পর থেকে একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ওর স্বপ্নপুরীর কাছে যায় বাশেভিস। মনে আশা, যদি আর একবার দেখা যেতো সেই লাল রিবনপরা মেয়েটিকে। কিন্তু আশা আশাই থেকে যায়, দেখা পায় না ও অপূর্ব সুন্দরী গোল্ডার।

এক অপরাহ্নে, ডা. সিঙ্গারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাশেভিস শুনতে পেলো ভেতর থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর সুর। ভীষণ মিষ্টি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে দাঁড়ালো ও। 'এতো সুন্দর সুর গোল্ডা ছাড়া কেউ বাজাতে পারে না; আজ, এই মুহূর্তে, ওকে দেখতেই হবে।' বাশেভিস এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। বাড়ির দেয়ালের কাছে চলে এলো ও। সোজা ওর মাথার ওপর, দোতলা থেকে ভেসে আসছে সুর। কিছুটা পিছিয়ে এসে দেয়াল পরীক্ষা করলো বাশেভিস। দেয়ালে অনেকগুলো পাইপ। কোনো চিন্তাভাবনা না করেই একটা পাইপ বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠতে আরম্ভ করলো ও। কিন্তু উঠতে উঠতে বাশেভিস বুঝলো ওর আন্দাজের চেয়ে দোতলা অনেক উঁচুতে; মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট। জানালার কাছে পৌঁছে নিচে তাকাতেই বুক কেঁপে উঠলো ওর। কিন্তু তা মুহূর্ত মাত্র, সুরের মূর্ছনায় সবকিছু ভুলে গেল বাশেভিস। এখন আগের চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে সুরটা শুনতে পাচ্ছে ও। 'বাশেভিস, গোল্ডা শুধু তোমাকে শোনানোর জন্যেই পিয়ানো বাজাচ্ছে,' ওর অবচেতন মন বুকের ভেতর থেকে ফিসফিস করে বললো ওকে।

আর একটা পাইপ ধরে জানালার নিচের চৌকাঠে দাঁড়ালো বাশেভিস। বাতাসে দোল খাচ্ছে পর্দা। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ও দেখেঃ একটা পিয়ানোর সামনে বসে আছে গোল্ডা, পিয়ানোর রং সোনালী; পিছনে, একটা আর্মচেয়ারে বসে বই পড়ছেন ডা. সিঙ্গার। ডাক্তারের দিকে চোখ যাচ্ছেই না বাশেভিসের; ওর দৃষ্টি পড়ে আছে পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যটির ওপর, যার নাম গোল্ডা, যে এখন ওর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। গলায় সেই মন ভোলানো লাল রিবন।

'আমি ওকে ভালবাসি। আমি এমন কিছু দর্শনীয় আর বীরত্বপূর্ণ কাজ করবো

যা ওকে মুগ্ধ করবে এবং ও আমার প্রেমে পড়বে। আমি এমন কিছু . . .।' নিজের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে পাইপের ওপর নিজের হাতের মুঠো কখন আলগা করে ফেলেছে টেরই পায়নি বাশেভিস। দোতলার জানালা থেকে শূন্যের ভেতর নিক্ষিপ্ত হলো ওর শরীর। নিচে পড়ে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠলো ও; আর ওর শরীর মাটি ছোঁয়ার আগে বাশেভিস দেখে দুটো আতঙ্কিত মুখ জানালা থেকে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

বাশেভিসের চেতনা ফিরলো ডা. সিঙ্গারের অপারেশন টেবিলে। ঘরটা বেশ বড়ো। চারদিকে ক্যাবিনেট, তাকগুলো অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। ডা. সিঙ্গার ওর নাকে এক টুকরো তুলো ধরে আছেন। ওটার বিশ্রী গন্ধে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ছটফট করতে করতে উঠে বসলো ও।

'যাক, আমি এজন্যেই অপেক্ষা করছিলাম,' বললেন ডাক্তার, 'আমি এখন তোমার ঘিলু বের করবো, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার মাথায় ঘিলু বলে কোনকিছু নেই। এই ছোকরা, এখন বলো, তুমি কি চুরি করার মতলব এঁটেছিলে?'

'কিছুই না,' বেশ ঝাঁজের সঙ্গে উত্তর দিলো বাশেভিস। ওর কথায় প্রকাশ পাচ্ছে ঘৃণা, ক্রোধ।

'তোমার নাম কি?'

'বাশেভিস মেয়ার।'

বাশেভিসের ডান কবজি নিয়ে এক যন্ত্রণাদায়ক খেলা আরম্ভ করলো ডা. সিঙ্গারের আঙুলগুলো। কখনো টিপছে, কখনো খোঁচাচ্ছে, কখনো চেপে ধরছে. . .। থেকে থেকে ব্যথায় ককিয়ে উঠছে বাশেভিস।

'কেমন লাগছে, বাশেভিস মেয়ার? শোনো, তোমার ডান কবজি ভেঙে গেছে। ওটা মেরামত করার দায়িত্ব পুলিসের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠলো বাশেভিস। কল্পনায় দেখার চেষ্টা করছে পুলিস ওকে এই অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেলে বাড়িতে কি রকম দৃশ্যের অবতারণা

হবে! লজ্জায়, শোকে পাথর হয়ে যাবেন খালা। বাবা ওকে মেরেই ফেলবেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, কেমন করে ও আর গোল্ডার মন জয় করার আশা বুকের ভেতরে পুষে রাখবে? এরপরে ওর পরিচয় হবে একজন দাগি অপরাধীর।

ডা. আইজাক সিঙ্গারের আঙুলগুলো তখনো বাশেভিসের কবজি নিয়ে খেলছে। হঠাৎ ও কবজির মধ্যে অনুভব করলো প্রচণ্ড ব্যথা এবং সেই সঙ্গে একটা আকস্মিক ঝাঁকুনি। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে গেছে মাথা। বিস্ময়ে ডাক্তারের চোখের দিকে তাকালো ও।

'হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে,' ওর চোখে চোখ রেখে বললেন ডাক্তার, 'তোমার কবজি জোড়া লেগেছে।' তারপর তিনি কবজিতে একটা কাঠ বসিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে প্রশ্ন করলেন, 'বাশেভিস মেয়ার, তুমি আমার বাড়ির আশেপাশে সবসময় ঘুরঘুর করো?'

'না, স্যার।'

'কিন্তু আমি তোমাকে আমার জানালা থেকে পড়ে যেতে দেখেছি, ঠিক কিনা?'

'জ্বি, স্যার।'

'কেন উঠেছিলে? '

কেন? বাশেভিস যদি সত্যি কথা বলে, ডাক্তার তাহলে ওকে পাগল ভেবে হাসতে থাকবেন। কিন্তু ভাবার সময় হাতে নেই। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ও।

'আমি ডাক্তার হতে চাই,' বোকার মতো বলে ফেললো বাশেভিস।

এমন তীব্র মানসিক আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না ডাক্তার আইজাক সিঙ্গার। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছেন তিনি। ছেলেটার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। ফ্যালফ্যাল করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাশেভিসের দিকে।

'এজন্যেই তুমি চোরের মতো দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠেছো?' অনেকক্ষণ পর বাস্তবে ফিরে এসে জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'হ্যাঁ।' কিন্তু শুধু জবাব দিয়েই চুপ করে থাকলো না বাশেভিস। বাঁধ ভেঙে

গেছে ওর। স্রোতের মতো গলগল করে বেরিয়ে আসছে কথা। নিজের জীবনের সব কাহিনীই বললো ও, কিছুই বাদ দিলো না। শোনালো রাস্তায় ওর মায়ের মৃত্যুর কথা। বাবার কথা। ক্রাকোভ শহরে প্রথম দিন বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা। রাতে ক্যাম্পের পাঁচিলের মধ্যে তালাবন্ধ হয়ে পশুর মতো জীবন যাপনের কথা। শোনালো গোল্ডাকে নিয়ে ওর স্বপ্নের কথা। নীরবে ওর প্রতিটি কথাই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ডাক্তার। বাশেভিসের নিজের কানেই ওর বলা কথাগুলো হাস্যকর মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ব্যঙ্গ, উপহাস, বিদ্রূপ, ঠাট্টা। গল্প শেষ করে ও ফিসফিসিয়ে বললো, 'স্যার, আমি···আমি দুঃখিত।'

বাশেভিসের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ডাক্তার সিঙ্গার। কেটে যাচ্ছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। কি যেন বলবেন বলবেন করছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। অবশেষে বললেন, 'বাশেভিস, আমিও দুঃখিত। তোমার জন্যে, আমার জন্যে, আমাদের সবার জন্যে। আসলে প্রতিটি মানুষই বন্দী। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো একজন মানুষের হাতে আর একজন মনুষের বন্দিত্ব।'

ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে বাশেভিস। ডাক্তারের দিকে মুখ তুলে বললো, 'স্যার, আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার বললেন, 'একদিন পারবে।'

চেয়ার ছেড়ে একটা ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন ডা. সিঙ্গার। ডেস্কের ওপর তামাক খাবার অনেকগুলো পাইপ সাজানো। একটা বেছে নিয়ে খুব ধীরগতিতে যত্নের সাথে তামাক ভরতে ভরতে মুখ না তুলেই বললেন, 'বাশেভিস মেয়ার, আমি দুঃখিত। আজকের দিনটা তোমার জন্যে অশুভ।'

দেশলাই জ্বালিয়ে তামাকে আগুন লাগালেন ডা. সিঙ্গার। একটা লম্বা টান দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বাশেভিসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আজ তোমার কবজি ভেঙেছে, কিন্তু দিনটা সেজন্যে অশুভ নয়। আমি কবজি জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ওটা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোমার বুকে এখন কিছু ক্ষত সৃষ্টি করবো যা শুকোতে অনেক সময় লাগবে, কিংবা কে জানে নাও শুকোতে পারে।'

ডাক্তারের চোখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না বাশেভিস। এক অজানা আতঙ্কের আশঙ্কায় বন্ধ হয়ে গেছে যেন ওর রক্ত চলাচল।

ডা. সিঙ্গার ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আবেগ-তাড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষের কোনো স্বপ্ন থাকে না। তোমার দু-দুটো স্বপ্ন আছে। দুঃখিত, আমি ও দুটোকেই চিরকালের জন্যে ধ্বংস করতে যাচ্ছি।'

'না . . . ।'

'বাশেভিস, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আমাদের সমাজে তুমি কখনোই ডাক্তার হতে পারবে না। এই বন্দীশালায় শুধুমাত্র তিনজন ডাক্তারকে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেয়া হয়। আমার জানামতে এখন এখানে কমপক্ষে বারোজন পাস-করা ডাক্তার বসে আছে। ওরা অপেক্ষা করছে কবে আমরা অবসর নেবো কিংবা মারা যাবো। তোমার জীবিতকালে ডাক্তার হবার কোনো সুযোগই তুমি পাবে না। কখনোই না। তুমি ভুল সময়ে ভুল জায়গায় জন্ম নিয়েছো। আমার কথা বুঝতে পাচ্ছো, বাশেভিস?'

'হ্যাঁ, স্যার।' উত্তর দিতে কোনো সময় নিল্লে না বাশেভিস। ডাক্তারের যুক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই।

আবার কথা শুরু করতে গিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ডা. সিঙ্গার বললেন, 'তোমার দ্বিতীয় স্বপ্ন সম্পর্কেও আমাকে একই কথা বলতে হচ্ছে। তোমার সে স্বপ্নও পূরণ হবে না। গোল্ডাকে বিয়ে করার কোনো সম্ভাবনাই তোমার নেই।'

'কেন, স্যার?' ভদ্রভাবে জানতে চাইলো বাশেভিস।

'একই কারণে; যে কারণে তুমি ডাক্তার হতে পারবে না। পৃথিবীতে মানুষকে অনেক সামাজিক নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ নিয়ে বাস করতে হয়। আমার মেয়ে এমন কাউকে বিয়ে করবে, যে হবে ওর সমকক্ষ, ওর শ্রেণীর, ওর স্তরের। ও হয়তো বিয়ে করবে কোনো ডাক্তারকে, কোনো আইনজীবীকে। আশা করি, তুমি তোমার মাথা থেকে ওর চিন্তা বের করে দেবে। ওর কথা ভুলে যাও।'

'কিন্তু . . .'

বাশেভিসকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার ইঙ্গিত করে ডাক্তার বললেন, 'শোনো, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কবজিটা কাউকে দেখাবে, আর ব্যাণ্ডেজটা ময়লা করো না।'

'ঠিক আছে, স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ, ডা. সিঙ্গার।'

'গুডবাই, বাশেভিস মেয়ার।' লাল চুনঅলা বালকের দিকে তাকিয়ে রইলেন ডা. সিঙ্গার। ছেলেটার বোধশক্তি খুবই প্রখর; বুদ্ধিমান। কিন্তু কি করবেন তিনি?

পরের দিন সন্ধ্যার আগেই ডা. আইজাক সিঙ্গারের বাড়ির দরজায় বেল টিপলো বাশেভিস। জানালা দিয়ে ওকে দেখতে পেলেন ডাক্তার। না, ওকে বিদায় করে দিতে হবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। কিন্তু বাড়ির ঝি-কে নির্দেশ দেয়ার সময় বললেন, 'যাও, ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

ঘরের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতেই প্রশ্নের মুখোমুখি হলো বাশেভিস। 'কি চাও?'

উত্তর দিতে গলা এতটুকু কাঁপলো না বাশেভিসের। 'ডা. সিঙ্গার, আমি আপনার সাথে কোনো বিতর্ক করতে আসিনি। তবে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই। ডাক্তার হতে না পারলেও আমাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।'

ওর দৃঢ়তায় আশ্চর্য হননি ডাক্তার, কিন্তু কথা না বলে শুধু মাথা দোলালেন।

সেই হলো শুরু।

সপ্তাহে দু থেকে তিনদিন ডাক্তারের বাড়িতে আসে বাশেভিস। ফাইফরমাশ খাটে। অসুস্থ মানুষের বাড়িতে যায়, অসুখের খবর দেয়ানেয়া করে। বিনিময়ে ডাক্তার ওকে রোগীকে চিকিৎসা করার সময় পাশে থাকতে দেন, ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে দেন, ওষুধ বানানো দেখতে দেন। একবার কোনকিছু দেখলেই বাশেভিস তা শিখে ফেলে এবং মনে রাখতে পারে। সহজাত প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিল ও। ওর মেধার পরিচয় পেয়ে ডাক্তার ওকে লেখাপড়া শেখারও সুযোগ করে দিলেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে এক ধরনের পাপবোধে ভোগেন ডা. সিঙ্গার। বাশেভিসকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন তিনি, উৎসাহ যোগাচ্ছেন এমন কিছু হবার জন্যে যা সে কখনোই হতে পারবে না, অথচ নিজেকে অনেক বোঝানোর পরও তাড়িয়ে দিতে পারছেন না ছেলেটাকে।

এদিকে দুর্ঘটনাক্রমে হোক আর দৈবচক্রে হোক, ডাক্তারের বাড়িতে এলে প্রতিদিনই একবার না একবার গোল্ডাকে দেখতে পায় বাশেভিস। হয়তো কখনো ল্যাবরেটরীর পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, কখনো বাইরে বেরুতে যায়।

একদিন রান্নাঘরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে গোল্ডার ওপর পড়তে যাচ্ছিল বাশেভিস। ঘটনার আকস্মিকতায় বাশেভিসের হৃৎপিণ্ড এমনভাবে লাফাতে লাগলো যে মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও। অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো গোল্ডা। কিন্তু বাশেভিসের মনে হলো অহেতুক ওকে দেখছে না গোল্ডা, ওর ভেতরে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছে। তারপর খুব শান্তভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে চলে গেল গোল্ডা। এটাই ওদের প্রথম চোখাচোখি।

পরের কয়েক বছর ঘন্টার পর ঘন্টা ডা. সিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে সময় কাটাতে লাগলো বাশেভিস। মলম আর মিক্সচার তৈরি করা শিখলো। কিভাবে ওগুলো কাজ করে তাও শিখলো। আর গোল্ডা কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে ওর কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। সুন্দরী, রহস্যময়ী; গলায় লাল রিবন পরতে কখনো ভোলে না।

সময়ের সাথে সাথে অসুখ নয়, ওষুধের ওপর আগ্রহ জন্মালো বাশেভিসের। ডা. সিঙ্গারের লাইব্রেরী গাদাগাদা বই আর ম্যাগাজিনে ঠাসা। গভীর মনোযোগ দিয়ে ওগুলো পড়ে ও; তত্ত্ব নিয়ে আলাপ করে ডাক্তারের সঙ্গে।

একদিন ডা. সিঙ্গারকে বাশেভিস জানালো, 'ডা., চিকিৎসাশাস্ত্রের যুক্তি থেকে আমার ধারণা জন্মেছে, প্রতিটি অসুখের একটা না একটা প্রতিকার অর্থাৎ ওষুধ থাকতেই হবে। সুস্থতা প্রাকৃতিক, অসুখ অপ্রাকৃতিক।'

'ঠিক বলেছো,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু এখানকার বেশির ভাগ রোগী নতুন

ওষুধ ব্যবহার করতে চায় না।'

সে-সময় সব বিষয়ে বিজ্ঞানের জয়জয়কার। নিত্য নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেনঃ শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে জীবানু আক্রমণ করতে পারবে না, ফলে অসুখ হবে না; সেরাম এবং ভ্যাকসিন এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। ডা. আইজাক সিঙ্গার নিজেও একবার পরীক্ষা চালালেন। এক ডিপথিরিয়া রোগীর রক্ত নিয়ে একটা ঘোড়াকে ইনজেকশন দিলেন। কিন্তু ঘোড়াটা মারা যাওয়ায় হাল ছেড়ে দিলেন তিনি। তবে বাশেভিস দমলো না, ওর বিশ্বাস ডাক্তার ঠিক পথেই এগোচ্ছিলেন।

ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করলো ও। 'ডা., আপনি বসে থাকলেও সময় বসে থাকবে না। আমি নিশ্চিত এপথেই সেরাম তৈরি হবে।'

'বাশেভিস, তোমার বয়েস মাত্র সতেরো বলেই তুমি এতো নিশ্চিত হতে পারছো। কিন্তু আমার বয়সের একজন মানুষ কোনো বিষয়েই নিশ্চিত হতে পারে না,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডা. সিঙ্গার বললেন, 'ওসব ভুলে যাও।'

ডাক্তারের কথায় বাশেভিসের ধারণা এতটুকু পাল্টালো না। পরীক্ষাটা ও নিজেই করে দেখতে চায়। প্রয়োজন একটা জন্তু। প্রথমে বেড়াল তারপর ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালালো ও। কিন্তু একটাও বাঁচলো না। নিজের ভুল বুঝতে পারলো বাশেভিস। বড় জন্তু ছাড়া ইনজেকশনের ডোজ কেউ সহ্য করতে পারবে না। তাহলে দরকার ঘোড়া, গরু কিংবা মোষ। কিন্তু কিভাবে ওগুলো যোগাড় করবে ও, কেনার টাকা কোথায়? হতাশায় চোখে পানি এলো ওর।

এক সন্ধ্যায়, ডাক্তারের ল্যাবরেটরী থেকে ফিরতে বেশ দেরি হলো বাশেভিসের। ফিরে দেখে, ওদের বাড়ির সামনে একটা নতুন গাড়ি, তার সামনে একটা ঘোড়া। গাড়ির এক কোণায় লেখাঃ মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স। অবিশ্বাসে, আনন্দে এক ছুটে ভেতরে ঢুকে বাবার কাছে জানতে চাইলো ও, 'বাবা, বাইরে ওই ঘোড়াটা কার?'

'আমাদের। কিনেছি। ওর নাম লার্থা,' বেশ গর্বের সাথে হাসতে হাসতে

জবাব দিলেন ওর বাবা।

ওর বাবার অনেকদিনের স্বপ্ন একটা ঘোড়ার গাড়ি কেনার। তাতে অল্প সময়ে অনেক বেশি জায়গায় ঘুরে ঘুরে মাল বেচা যাবে। 'আমার বাবার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, এবার আমার স্বপ্ন পূরণ করবে লার্থা,' মনে মনে বললো বাশেভিস।

ওদের ছোট্ট কাঠের বাড়ির এক কোণে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা আছে। খালা, বাবা, ছেলে তিনজনে মিলে জোড়াতালি দিয়ে সেখানে একটা আস্তাবল তৈরি করলো লার্থার জন্যে। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তাবলে ঢুকে লার্থার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বাশেভিস বললো, 'লার্থা, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তুমি আমার ওষুধের দোকান হতে যাচ্ছো।' কয়েকদিনের চেষ্টায় ডা. আইজাক সিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে একটা ঝোলভর্তি পাত্রে ডিপথিরিয়ার জীবাণু সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো বাশেভিস। ঝোলের ওপর আস্তরণ পরার পর সেখান থেকে কিছুটা সরিয়ে নিলো অন্য একটা পাত্রে। ঝোলের জীবাণুগুলো দুর্বল করলো প্রথমে পানি মিশিয়ে পাতলা করে তারপর আগুনে জ্বাল দিয়ে। সিরিঞ্জে ঝোল তুলে নিয়ে ও এলো লার্থাকে ইনজেকশন দিতে।

লার্থার কাঁধের নরম চামড়ায় সূচ ঢুকিয়ে বাশেভিস বললো, 'লার্থা, মনে আছে আমার কথা? আজ তোমার জীবনের সেই শুভদিন এসেছে। এই তো কয়েকদিন, তারপর তোমাকে আর মাল বইতে হবে না। তোমার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবো আমি আর গোল্ডা।'

বাশেভিস হিসেব করে দেখলো লার্থার শরীরে জীবাণু বিকশিত হতে বাহাত্তর ঘন্টা সময় লাগবে। সে সময় পার হয়ে গেলে আর একটা বড় ডোজ দিতে হবে ওকে। তারপর আর একটা। অ্যান্টিবডি তত্ত্ব সঠিক হলে প্রতি ডোজের পর রক্তের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। সেই রক্ত থেকে বাশেভিস পেয়ে যাবে ওর ভ্যাকসিন। এরপর পরীক্ষা চালাতে হবে মানুষের শরীরের ওপর।

পরের দু'রাত চোখের পাতা এক করতে পারলো না বাশেভিস, বারবার উঠে উঠে যায় লার্থার পাশে, শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে। কতো কি

আবোলতাবোল কথা বলে কিছুই ঘুঝতে পারে না মূর্খ জন্তু।

অবশেষে এলো সেই চূড়ান্ত দিন। সকালে বাশেভিসের ঘুম ভাঙে ওর বাবার চিৎকারে। তাড়াহুড়ো করে জানালায় মুখ বাড়িয়ে ও দেখে বাইরে, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ওর বাবা চিৎকার করছেন, 'মিথ্যুক! প্রতারক। চোর!' পাশে পড়ে আছে গাড়ি; লার্থা নেই। বাবাকে ঘিরে জমছে মানুষের ভিড়।

এক দৌড়ে ভিড় ঠেলে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে বাশেভিস জানতে চাইলো, 'বাবা, লার্থা কই?'

'মারা গেছে,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন ওর বাবা, 'বাশেভিস, তুই তো জানিস, আমরা ওকে কতো ভালবাসতাম! আমি কখনো ওর ওপর অত্যাচার করিনি। গাড়িতে বেশি মাল তুলিনি, বেশিক্ষণ একটানা ঘুরাইনি, চাবুক মারিনি। আমি ওই বাটপার ব্যাপারীকে দেখে নেবো। মিথ্যুক! ঠক! আমার সারা জীবনের জমানো টাকা নিয়ে মরা ঘোড়া গছিয়েছে আমাকে।'

বুক চিনচিন করে উঠলো বাশেভিসের। দম নিতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। একটা নয়, একসঙ্গে চার-চারটা যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি আক্রমণ করেছে ওকে। বাবাকে ফতুর করেছে ও, লার্থাকে খুন করেছে, ডাক্তার হবার স্বপ্নটার গোড়া কেটে ফেলেছে, সে সঙ্গে হারিয়ে গেছে গোন্ডাকে পাবার সমস্ত সম্ভাবনা। বাবা জানে না প্রতারক ব্যাপারী নয়; প্রতারক তার ছেলে, বাশেভিস। সে কথা কোনদিনও বাবাকে বলতে পারবে না ও। ওই পাপবোধ নিয়ে চিরকাল ওকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে ক্যাম্পের ভেতর। এই নরক থেকে বেরুবার সবগুলো পথ হারিয়ে ফেলেছে ও।

কিন্তু বাশেভিস তখন জানতো না ওর জন্যে আরো খারাপ খবর অপেক্ষা করছে।

সেদিন আর ডা. আইজাক সিঙ্গারের বাড়ি গেল না বাশেভিস। ফের কোনদিন যাবে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয় ও। এক ধরনের হীনতাবোধ পেয়ে বসেছে ওকে।

পরের দিন, ওর কানে এলো এক আইনজীবীর সঙ্গে গোন্ডার বিয়ে ঠিক

করছেন ওর বাবা-মা। এই আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না বাশেভিস। মুহূর্তেই মানসিক বাধা ভেঙে পড়লো ওর। না; এ হতে পারে না; গোল্ডা আমার, শুধু আমার। নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না বাশেভিস, দৌড়োতে দৌড়োতে ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকলো ও।

বারান্দায় বসেছিলেন ডা. সিঙ্গার এবং গোল্ডার মা। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো বাশেভিস, 'শুনুন, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ভুলটা গোল্ডার। ও আমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালো স্বামী-স্ত্রী।

'আমি জানি আমি ওর উপযুক্ত নই,' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে বাশেভিস, 'কিন্তু ও আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হবে না। ওই আইনজীবী একটা বুড়ো···'

'ইতর! নীচ! বেরোও! বেরোও!' চিৎকার করে উঠলেন মিসেস সিঙ্গার।

সংবিৎ ফিরলে এক মিনিট পর বাশেভিস দেখলো সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, চিরকালের জন্যে ডা. সিঙ্গারের বাড়িতে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে ওর জন্যে।

সে রাতে ঈশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘ সময় তর্ক করলো বাশেভিস। 'তুমি কি চাও আমার কাছে? যদি গোল্ডাকে বিয়ে করতে না পারি, তাহলে কেন ওর জন্যে আমার বুকে

ভালবাসা জন্মালে? তোমার কি কোনো অনুভূতি নেই?'

পরের দিন বিকেলে বাশেভিসকে ডেকে পাঠালেন ডা. সিঙ্গার। বাড়ির ভেতরে ঢুকে ও দেখে, ঘরে শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, তাদের পাশে বসে আছে গোল্ডাও।

'বাশেভিস, ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে আমরা সবাই একটা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি,' কথা আরম্ভ করলেন ডা. সিঙ্গার, 'আমাদের মেয়ে অনেক আদরে মানুষ হয়েছে, এ কারণে ছোটবেলা থেকেই ও কিছুটা জেদী। গতকাল থেকে ও পুরনো জেদের পরিচয় দিচ্ছে। ওর কথা থেকে মনে হচ্ছে ও তোমার প্রেমে পড়েছে। আমি একে প্রেম বলবো না, কেননা প্রেমের মানে

বোঝার বয়েস ওর এখনো হয়নি। যাহোক, ও ওই আইনজীবীকে বিয়ে করবে না। ও তোমাকে বিয়ে করতে চায়।'

আড়চোখে প্রেমিকার দিকে তাকালো বাশেভিস। হাসছে গোল্ডা। এতো আনন্দঘন মুহূর্ত জীবনে কখনো আসেনি বাশেভিসের। কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দিলেন না ডা. সিঙ্গার।

'বাশেভিস, প্রথম দিন তুমি বলেছিলে আমার মেয়েকে তুমি ভালবাসো।'

'হুঁ···য়···ণ···হ্যাঁ, স্যার,' তোতলাতে তোতলাতে বললো বাশেভিস।

'তাহলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, বাশেভিস। তুমি কি চাও গোল্ডা একজন ফেরিঅলাকে বিয়ে করে ওর বাকি জীবন কাটাবে?'

গোল্ডার চোখে চোখ রেখে বাশেভিস বললো, 'না, স্যার।'

'তাহলে তুমি সমস্যাটা বুঝতে পেরেছো। আমরা কেউ চাই না গোল্ডা একজন ফেরিঅলাকে বিয়ে করুক। কিন্তু তুমি একজন ফেরিঅলা, বাশেভিস।'

'আমি চিরকাল তা থাকবো না, ডা. সিঙ্গার।' গলায় আবার দৃঢ়তা ফিরে এসেছে বাশেভিসের। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস সিঙ্গার, তাকে থামিয়ে ডাক্তার বললেন, 'আমরা একটা আপোসে পৌঁছেছি। তোমাকে ছয় মাস সময় দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি শুধু একজন ফেরিঅলা নও। তা না হলে গোল্ডা ওই আইনজীবীকেই বিয়ে করবে।'

'মাত্র ছয় মাস!'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

ডাক্তারের ইঙ্গিত ভালোমতই বুঝতে পেরেছে বাশেভিস। জামাই হিসেবে তিনি পেতে চাইছেন কোনো ডাক্তার কিংবা আইনজ্ঞ, আর নয়তো কোনো ধনবান ছেলে। অথচ ওর পক্ষে ওই তিনটার কোনটা হবার সম্ভাবনাই নেই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ডাক্তার হওয়া যাবে না। আইনজ্ঞ হবার জন্যে লেখাপড়া করার বয়েস নেই। আর চব্বিশ ঘন্টা ধরে ক্যাম্পের রাস্তায় রাস্তায় মাল বিক্রি করলেও নব্বই বছর বয়সে ও গরীবই থেকে যাবে। ডাক্তার সিঙ্গার এবং তার

স্ত্রী সে কথা জানেন। সেজন্যেই তারা ওই প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু গোন্ডা? ডাক্তার বলেছেন তারা সবাই মিলে আপোসে পৌঁছেছেন। তাহলে কি গোন্ডা বিশ্বাস করে ছয় মাসে বাশেভিস সেই অলৌকিক ঘটনাটা ঘটাতে পারবে? নাহলে তো ও রাজি হতো না। কথাটা ভাবতেই সমস্ত হতাশা ঝরে পড়লো বাশেভিসের মন থেকে।

শুরু হলো অগ্নি পরীক্ষার ছয় মাস। সারাদিন ব্যবার সঙ্গে মাল ফেরি করে বাশেভিস । সূর্য ডুবতে না ডুবতেই ছুটে আসে বাড়িতে, গোগ্রাসে কিছু গিলে ঢোকে লার্থার ফেলে যাওয়া আস্তাবলে। সেটাই এখন ওর ল্যাবরেটরী। ইতিমধ্যে প্রায় একশো রকমের সেরাম তৈরি করেছে ও। সেগুলোকে প্রয়োগ করে ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর এবং পাখির ওপর, কিন্তু কেউ বেঁচে থাকে না। হতাশা এলেও ও আগের মতো ভাবে প্রাণীগুলো ছোট, তাই ডোজ সহ্য করতে পারছে না, দরকার বড় জন্তু। কিন্তু কোথায় ও পাবে বড় জন্তু, এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে।

সপ্তাহে দুদিন ও যায় ক্রাকোভ শহরে বাবার সঙ্গে মাল কিনতে। তিনদিন অনুমতি পায় গোন্ডার সঙ্গে দেখা করার। এটাই ওর একমাত্র সান্ত্বনা। যদিও খোলামেলা মেশার সুযোগ ওদের দেয়া হয় না, সবসময় গোন্ডার পাশে থাকে একজন সহচরী। প্রতিবার দেখার মুহূর্তে প্রেমের তীব্রতা বাড়ে বাশেভিসের, কিন্তু প্রতিবারই এক মিশ্র অনুভূতি কুরেকুরে খায় ওকে। যতো বেশি দেখা হচ্ছে গোন্ডার সঙ্গে ততো বেশি কমে আসছে ওকে হারানোর সময়। অথচ প্রতিবারই গোন্ডা ওকে আশ্বাস দেয়, 'বাশেভিস, ভেবো না, পথ একটা খুঁজে পাবেই।'

মাঝে মাঝে গোন্ডাকে নিয়ে পালাবার কথা ভাবে বাশেভিস। কিন্তু যাবে কোথায়? অন্য কোনো ক্যাম্পে? না, এজন্যে গোন্ডাকে ভালবাসেনি ও। গোন্ডার কোনো সর্বনাশ করতে পারবে না ও।

এদিকে সময়ের চাকা গড়াতে গড়াতে তিন সপ্তাহে এসে ঠেকলো। অথচ বাশেভিসের অবস্থা আগের মতোই, যেখানে শুরু করেছিল সেখানেই থমকে আছে।

এক রাতে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আস্তাবলে কাজ করছে বাশেভিস; এমন সময় চুপিচুপি ভেতরে ঢুকলো গোন্ডা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না বাশেভিস।

বাশেভিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে গোন্ডা বললো, 'বাশেভিস, চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

ওর প্রেমের এমন শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত আগে কখনো আসেনি বাশেভিসের। বুঝতে পারলো, গোন্ডাকে ও যতটা ভালবাসে গোন্ডা ওকে তারচেয়েও বেশি ভালবাসে। স্বেচ্ছায় ও সবকিছু হারাতে চাইছে; বাবা, মা, সুন্দর জীবন, বাড়ি।

গোন্ডাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বাশেভিস বললো, 'তা হয় না, গোন্ডা। যেখানেই যাই না কেন আমি একজন ফেরিঅলাই থাকবো।'

'আমার তাতে কিছু যায় আসে না।'

'না। আমি তা পারবো না।'

'ঠিক আছে। তুমি যা চাইবে তাই হবে।' ওকে চুমু খেয়ে চলে গেল গোন্ডা। যাওয়ার সময় দিয়ে গেল একটা থলি। ওর এতদিনের জমানো টাকা।

পরের দিন সকালে মাল কিনতে শহরে যাবার পথে বাশেভিসের সঙ্গে দেখা হলো ওর ছোটবেলার বন্ধু আসিমভের। আসিমভ ওদের ঘোড়াটা বিক্রি করতে যাচ্ছিল। ঘোড়াটার অবস্থা মরোমরো। এক চোখ কানা হয়ে গেছে, ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না।

'গুড মর্নিং, বাশেভিস।'

'মর্নিং, আসিমভ। ঘোড়াটার এই হাল কেন? দেখে মনে হচ্ছে এখনি মারা যাবে।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই দৌড়োচ্ছি। কোথাও গছাতে পারলে বেঁচে যাই।'

'কেউ কিনবে বলে মনে হয় না। এক কাজ করো, আমার গাড়িটা নাও। এর চেয়ে বেশি দাম পাবে না।'

'কিন্তু তুমি?'

'সে নিয়ে ভেবো না। আমার কাছে গাড়ি কেনার পয়সা আছে।'

একটা নতুন গাড়ি কিনে মাল ভর্তি করে আসিমভের ঘোড়া রোতিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো বাশেভিস। এবং রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নতুন উদ্যমে শুরু করলো সেরাম বানানো।

ক্যাম্পে সংক্রামক রোগের মহামারী লেগেই থাকে। নতুন যে রোগটা মহামারীর আকার ধারণ করেছে সেটা এক ধরনের জ্বর। প্রচণ্ড জ্বর ওঠে, কাশতে কাশতে রোগীর দম বন্ধ হয়ে আসে, শরীরের গ্রন্থিগুলো ফুলে ওঠে, অসহ্য ব্যথায় রোগী মারা যায়। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও রোগের কারণ ধরতে পারছেন না, চিকিৎসার প্রশ্নই ওঠে না, আশঙ্কাজনক হারে মারা যাচ্ছে মানুষ।

সে রোগ ধরলো আসিমভের বাবাকে। খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আসিমভের বাসায় ছুটলো বাশেভিস।

'ডাক্তার দেখে গেছে,' কাঁদতে কাঁদতে বললো আসিমভ, 'তারা বলেছেন, কিছুই করার নেই।'

'এতো ভেঙে পড়ো না, আসিমভ। এক কাজ করো, তোমার বাবার একটা রুমাল নিয়ে এসো যেটাতে তিনি কফ ফেলেন। কিন্তু সাবধানে রুমালটা ধরবে, কফে অনেক জীবাণু আছে।'

এক ঘন্টা পর আসিমভের বাবার কফ ভর্তি রুমাল নিয়ে নিজের ল্যাবরেটরীতে ফিরলো বাশেভিস।

রুমালে শুকিয়ে যাওয়া কড়কড়ে কফ চেঁচে নিয়ে সেগুলোকে একটা ঝোলভর্তি পাত্রে ঢেলে দিনরাত কাজ করতে শুরু করলো বাশেভিস। সে-রাত এবং পরের দু'দিন একটানা পরিশ্রমের পর ও পেলো সেরামের জীবাণু। ছোট্ট একটা ডোজ নিয়ে ইনজেকশন দিলো রোতিকে। তারপর আরম্ভ হলো ওর উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা।

আশ্চর্য! চব্বিশ ঘন্টা বেঁচে থাকলো রোতি, তার পরের চব্বিশ ঘন্টাও, এবং তার পরের চব্বিশ ঘন্টাও। বাহাত্তর ঘন্টা পর একটা বড় ডোজ দিলো বাশেভিস। না, পরের চব্বিশ ঘন্টাতেও মরলো না রোতি। এবার অনেকটা নিশ্চিত

বাশেভিস। ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস। চব্বিশ ঘন্টা পর শেষ ডোজটা রোতির শরীরে ঢুকিয়ে ও বললো, রোতি, ঘাবড়ে যেয়ো না, তুমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছো।'

হ্যাঁ, বেঁচে থাকলো রোতি। ওর রক্ত থেকে বাশেভিস পেলো অ্যান্টি-টকসিন। এবং একটা ভায়াল ভর্তি করে ছুটলো আসিমভদের বাড়িতে। ওর সৌভাগ্য, তখনো বেঁচে ছিলেন আসিমভের বাবা। কিন্তু অবস্থা একেবারে শেষ পর্যায়ে। বাড়ি থেকে ভেসে আসছে কান্না আর বিলাপ।

আসিমভকে ডেকে বাশেভিস বললো, 'আমি তোমার মা-র সঙ্গে কথা বলতে চাই।' মা-র কাছে বাশেভিসকে নিয়ে গেল আসিমভ। মুমূর্ষু স্বামীর পাশে বসে বিলাপ করছিলেন আসিমভের মা। বাশেভিস তাকে জানালো, ও আসিমভের বাবার শরীরে ওর বানানো সেরাম প্রয়োগ করতে চায়।

ঘরে উপস্থিত সবাই তাকালো বাশেভিসের দিকে। ওর হাতের ভায়ালটা দেখে কারো চোখেই আস্থা জাগলো না। কিন্তু আসিমভের মা-র সামনে তখন কোনো বিকল্প নেই। তার স্বামীর মৃত্যু অবধারিত। তাঁর হারাবার কিছুই নেই। তাহলে সুযোগ নিতে বাধা কোথায়? তিনি বাশেভিসকে অনুমতি দিলেন।

আসিমভের বাবাকে সেরাম ইনজেকশন দিয়ে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করলো বাশেভিস। কিন্তু রোগীর কোনো পরিবর্তন হলো না। সেরাম কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারলো না তার শরীরে। বরং কাশির মাত্রা বেড়ে গেল।

হতাশায়, মাথা হেঁট করে বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো বাশেভিস। সব শেষ। আর কোনো আশা নেই ডাক্তার হবার। গোল্ডাকে পাবার। সেদিন গোল্ডার কথায় রাজি হলে ভালো হতো। না, আর কোনদিন দেখা পাবে না ও লাল রিবন পরা মেয়েটির।

সারারাত ঘুমোতে পারলো না বাশেভিস। সকালে, ওর পা দুটো ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে টেনে নিয়ে এলো আসিমভদের বাড়ির সামনে। নীরব হয়ে আছে বাড়িটা। থেমে গেছে কান্না, বিলাপ। সব কি মরে গেল? ভয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো বাশেভিস।

কেটে যাচ্ছে মুহূর্ত। কেউ বেরুচ্ছে না। এদিকে বাশেভিসকে যেতে হবে ক্রাকোভ শহরে মাল কিনতে।

'আসিমভ,' ভয়ে ভয়ে ডাকলো বাশেভিস।

'বাশেভিস, তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা বেঁচে আছে। কাশিটা কমেছে।'

'বাঁচালে!'

'ভেতরে আসবে?'

'না, আমাকে শহরে যেতে হচ্ছে। তুমি কাছাকাছি থেকো। আমি তাড়াতাড়ি ফিরছি।'

ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে শহরে যাবার সময় বাশেভিসের মনে হলো জ্বরে কাঁপছে ও। দোকানে পৌঁছুতে রাস্তা ভুল করলো কয়েকবার। কি নেবে তাও ঠিকমতো বলতে পাচ্ছে না। ফেরার সময় দেখে, সন্ধ্যা নেমে গেছে।

ক্যাম্পের গেট থেকে তখনো দু'মাইল দূরে ও, সে সময় ভেঙে গেল গাড়ির একটা চাকা। হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাশেভিস। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো রাস্তার ওপর।

বাশেভিসের সামনে এখন দুটো সমস্যা; দুটোকে সমাধান করতে হবে একসঙ্গে। ওকে একটা চাকা যোগাড় করতে হবে; কিন্তু গাড়ি এবং মালপত্র রেখে ও যাবে কেমন করে। এদিকে ভিড় জমতে লাগলো। অনেককে অনুরোধ করলো বাশেভিস ওর গাড়ি আর মালপত্র দেখার জন্যে। কেউ রাজি হলো না। এমন সময় ভিড় ঠেলে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো একজন পুলিস।

'তোমার একটা নতুন চাকা দরকার তো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'জানো, কোথায় পাওয়া যায়?'

'না, স্যার।'

একটা চিরকুটে ঠিকানা লিখে বাশেভিসের হাতে দিয়ে পুলিস বললো, 'এখানে যাও।'

'আমার গাড়ি কে দেখবে?'

'আমি আছি । তাড়াতাড়ি ফিরবে।'

চিরকুটটা নিয়ে ছুটলো বাশেভিস। ক্রাকোভের রাস্তা ভালমতো চেনে না ও। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে চাকা কিনে ফিরলো বাশেভিস। চাকা লাগাতে আরো গেল আধঘন্টা।

দ্রুত নামছে রাত। আটটায় বন্ধ হয়ে যাবে গেট। হাতে ঘড়ি নেই। রাস্তা একেবারে নির্জন। গেট কি বন্ধ হয়ে গেছে? ভয়ে বুক কাঁপতে লাগলো ওর। ধরা পড়ার অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনেছে ও।

গেটে পাহারা দিচ্ছিলো লিয়ার। দুজন পাহারাদারের মধ্যে লিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর।

কিছু দেখতে পাচ্ছে না বাশেভিস। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তায় কোনো মানুষ নেই। গেটে পৌছার পাঁচ হাত বাকি থাকতেই ও দেখে তালা বন্ধ।

ভয়ে কেঁপে উঠলো বাশেভিস। চলার গতি কমালো। চোখ দুটো খুঁজছে গার্ড দুজনকে। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আশা জেগে উঠলো ওর মধ্যে। হয়তো ওরা কোথাও কোনো জরুরী অবস্থা সামলাতে গেছে। ভেতরে ঢোকার একটা না একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই; কোনভাবে তালা খুলে, ভেঙে, কিংবা পাঁচিল টপকে।

কিন্তু গেটের সামনে বাশেভিস দাঁড়াতেই ছায়ার মতো এগিয়ে এলো লিয়ার।

'না, না ওদিকে নয়, এদিকে এসো,' আদেশ করলো লিয়ার।

লিয়ারের নিষ্ঠুরতার অনেক কাহিনী শুনেছে বাশেভিস। পিছনে সরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ও।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো লিয়ার। 'বাছাধন, পালাবে কোথায়? তুমি ভুল গেটে এসেছো। এসো। কাছে এসো।'

বাশেভিসের মনে হলো একটা খোঁয়াড়ে আটকা পড়েছে ও। পালাবার পথ

নেই। পেট খিঁচুনি মারছে। মাথা দাপাচ্ছে।

উঠে, আস্তে আস্তে লিয়ারের দিকে এগোতে এগোতে বাশেভিস নিজের করুণ অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'স্যার, ভুল হয়ে গেছে। দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমি একটা দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার গাড়ি···'

'হ্যাঁ, এই তো সুবোধ ছেলে; এসো, এসো।'

লিয়ারের নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছে বাশেভিস। তখনো অনুনয় করছে, 'স্যার···ভুল হয়ে···দয়া করে···একটা দুর্ঘটনায়···আমার গাড়িটা···'

বাশেভিসের কলার ধরে ওকে শূন্যে তুলে মুখ ভেঙিয়ে লিয়ার বললো, 'কুত্তার বাচ্চা, ভেবেছ আমি ক্যাম্পের এক জারজের কৈফিয়ত শোনার জন্যে পাহারা দিচ্ছি? জানো, তোমাকে এখন কি করা হবে?'

অসহায়ের মতো মাথা নাড়লো বাশেভিস।

'শোনো, গত সপ্তাহে একটা নতুন আইন চালু হয়েছে। রাতে, গেটের বাইরে কেউ ধরা পড়লে তাকে দশ বছরের জন্যে সিলেসিয়া-য় নির্বাসনে পাঠানো হবে। কেমন লাগছে?'

বাশেভিসের মনে হলো হঠাৎ জীবনটা থমকে দাঁড়িয়েছে ওর। বাবা···খালা···আসিমভের বাবা···ডাক্তার হবার শেষ আশা···গোল্ডা···লাল রিবন···স্বপ্ন। তোতলাতে তোতলাতে ও বললো, 'কিন্তু আমি···আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।'

ওর ডান গালে কষে একটা চড় মেরে বাশেভিসকে মাটিতে ছুঁড়ে মারলো লিয়ার।

'চলো।'

'কো···কোথায় ?' আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে বাশেভিস।

'পুলিস ব্যারাকে। কাল সকালে ওরা তোমাকে সিলেসিয়া-র জাহাজে তুলে দেবে। ওঠো'।

বসে আছে বাশেভিস। ভাবনাগুলোকে সাজাতে পারছে না। 'আমাকে···আমাকে একবার ভেতরে যেতে দিন। আমার বাবার কাছ থেকে

বিদায় নিয়ে আসি।'

ভেঙচি কেটে লিয়ার জানালো, 'ভয় নেই, হারিয়ে যাচ্ছো না।'

'স্যার, দয়া করুন। অন্তত পক্ষে ওদের কাছে একটা খবর পাঠাতে দিন।'

ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় লিয়ার হুকুম করলো, 'ওঠো বলছি। আর একবার বলতে হলে লাথি মারবো।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো বাশেভিস। ওর একটা কবজি শক্ত করে ধরে পুলিস ব্যারাকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো লিয়ার। সিলেসিয়া-য় গেলে আর কখনো ফেরা হবে না। 'লিয়ার, আমার ওপর এমন অবিচার করো না,' হাত জোড় করে বললো বাশেভিস, 'আমাকে ছেড়ে দাও।'

ওর কবজি টিপতে আরম্ভ করলো লিয়ার। 'হ্যাঁ, ভিক্ষা চাও। ফরিয়াদ শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।'

দু'মাইল দূরে পুলিস ব্যারাক। পাশে একটা খরস্রোতা নদী। এক মাইল আগে পাথরের খোয়া বিছানো রাস্তা।

'আরো জোরে হাঁটো।'

খোয়া বিছানো রাস্তার ওপর এলো ওরা। খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে বাশেভিসের। হঠাৎ ওর সামনে ভেসে উঠলো একটা পুল। ওপারে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ব্যারাক।

পুলের ওপরের খোয়াগুলো অনেক বড়। হাঁটতে আরো কষ্ট হচ্ছে বাশেভিসের।

'নবাবের মতো হাঁটলে চাপকাবো কিন্তু। জোরে হাঁটো।'

ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে গার্ডদের হাসি। 'ওখানে ওৎ পেতে আছে আমার মরণ। না, এ হতে পারে না। আমাকে ফিরতেই হবে ক্যাম্পে। দেখতে হবে আসিমভের বাবার অবস্থা। যেভাবে হোক লিয়ারের হাত থেকে ছাড়া পেতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ওর আছে বন্দুক, তাছাড়া আমার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী ও। কিন্তু পালাতে আমাকে হবেই।'

ব্যারাক অনেক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি।

এদিকে লিয়ার আরো শক্ত করে চেপে ধরেছে ওর হাত।

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা দেখা দিলো বাশেভিসের মনে। গোল্ডার দেয়া টাকার থলেটা পকেটে আছে। ডান হাতটা মুক্ত। সেটা ঢোকালো পকেটে। থলে হাতিয়ে দেখে এখনো ছয়টা গাল্ডেন আছে। সাবধানে থলেটাকে বের করে এনে মুখের বাঁধনটা খুলে উপুড় করে ধরলো বাশেভিস। পাথরের খোয়ায় ধাতব শব্দ হলো মুদ্রার। ঝন্‌ঝন্।

শব্দ শুনেই থমকে দাঁড়ালো লিয়ার। বাশেভিসকে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের শব্দ?'

'জানি না,' তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো বাশেভিস।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙালো লিয়ার, তারপর বাশেভিসের হাতটা আরো শক্ত করে ধরে এক পা পিছিয়ে নিচে তাকাতেই খোলা থলেটা দেখতে পেলো ও।

'যেখানে যাচ্ছো সেখানে তোমার টাকার দরকার হবে না,' মন্তব্য করলো লিয়ার। থলেটা কুড়ানোর জন্যে বসে পড়লো ও। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো বাশেভিসও। লিয়ার যখন থলেটা তুলছে, তখন ও তুলছে একটা বড় পাথর।

লিয়ার উঠে দাঁড়াবার আগেই ওর ডান চোখে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটা ঠুকলো বাশেভিস। এবং মারতেই থাকলো। একবার, দুইবার···

দাঁড়িয়ে আছে লিয়ার। রক্তের দলা হয়ে গেছে ওর সমস্ত মুখমণ্ডল। চোখ দুটো নেই, সেখান থেকে ঝরছে রক্ত। নাকের চিহ্ন নেই। সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটছে রক্ত। তবু দাঁড়িয়ে আছে লিয়ার। ওকে মনে হচ্ছে একটা অন্ধ দানব। ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে বিবশ হয়ে পড়লো বাশেভিস। হারিয়ে ফেলেছে নতুন আঘাত হানার শক্তি। এমন সময় কাঁপতে আরম্ভ করলো লিয়ার। এবং কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না বাশেভিস। মানুষ খুন করেছে ও! ব্যারাক থেকে ভেসে আসছে গার্ডদের হাসি, কথাবার্তা। আর তখনি বুঝতে পারলো কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছে সে! এখন ধরা পড়লে ওকে আর সিলেসিয়া-য়

পাঠানো হবে না। টাউন স্কোয়ার-এ নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে ওরা। একজন পুলিসের গায়ে হাত তোলার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ও তো সে-জায়গায় একজনকে খুন করে ফেলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলো বাশেভিস ওর ইতিকর্তব্য। লিয়ারের পাশে বসে পকেটগুলো হাতড়ে হাতড়ে ও পেলো সেই বিশাল চাবিটা যা দিয়ে ক্যাম্পের গেটের তালা খোলা এবং বন্ধ করা হয়।

লিয়ারের পা দুটো ধরে টানতে টানতে নদীর পাড়ে এলো বাশেভিস। টেনে আনতে অনেক কষ্ট হচ্ছিলো ওর, লাশটার ওজন যেন এক টন। দম নেবার জন্যে দাঁড়ালো ও। তারপর স্রোতে ভাসিয়ে দিলো লাশ, পাথর। কিন্তু বিপদ এখনো কাটেনি। এখন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্পে ফিরতে হবে।

কম্পিত হাতে গেটের তালা খুলে গাড়িটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে কবাটটা টেনে দিয়ে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে দৌড়ে বাড়ি পৌছুলো বাশেভিস। ওদের ঘরে তখন বাড়ির তিন ঘরের বাসিন্দারা ওর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন মুহূর্ত কাটাচ্ছে। ওকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো সবাই।

'গার্ডরা তোমাকে ঢুকতে দিলো?' বাশেভিসকে একসঙ্গে সবাই প্রশ্ন করলো।

ওদেরকে সব ঘটনা শোনালো বাশেভিস। শুনে ওরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

'এখন কি হবে?' গোঙাতে লাগলেন বাশেভিসের বাবা, 'কাল সকালে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে।'

'না। যদি আপনারা আমার কথামতো কাজ করেন তাহলে কিছুই হবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো বাশেভিস।

'ঠিক আছে, বলো।'

পাঁচ মিনিট ধরে বাশেভিস ওদেরকে সবকিছু বোঝালো। নিজের পরিকল্পনাটাও শোনালো।

পনেরো মিনিট পর বাশেভিস, ওর বাবা, দুজন প্রতিবেশী গেটে এলো। সঙ্গে একটা মোটা, লম্বা দড়ি।

'এখন যদি অন্য গার্ডটা আসে, তাহলে?' শেষ মুহূর্তে বাশেভিসকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ওর বাবা।

'বাবা, ঘাবড়ে যেয়ো না। আমাদের একটা ঝুঁকি নিতেই হবে। দোয়া করো।'

কবাট খুলে বাইরে এলো বাশেভিস। বুক ধুকপুক করছে। যে কোনো মুহূর্তে দ্বিতীয় গার্ড জালমান আসতে পারে। পকেট থেকে চাবি বের করে কবাট বন্ধ করে তালা লাগালো ও। একটা বিপদ কেটেছে। কিন্তু বড় বিপদটা এখনো বাকি। ভেতরে ঢুকতে হবে। দেয়াল টপকানো সম্ভব নয়। ওপাশ থেকে বাবা দড়ি ফেলবেন। তাকে সাহায্য করবে দুই প্রতিবেশী।

বাঁ দিকে পাঁচ ফুটের মতো সরে এলো বাশেভিস। দেয়ালের গায়ে ওখানে একটা পিলার। পিলারের মাথায় মাথা বের করে আছে একটা লোহার গজাল।

ওপরে তাকালো বাশেভিস। হ্যাঁ। দেয়াল বেয়ে আস্তে আস্তে একটা সাপের মতো নেমে আসছে ওর বাবার ফেলা দড়ি। হাতের নাগালের মধ্যে আসতেই দড়িটা ধরে ঝুলতে লাগলো ও। ওদিক টানতে আরম্ভ করলেন বাশেভিসের বাবা আর দুই প্রতিবেশী।

দেয়ালের মাথায় পৌঁছে দড়ির গোড়ায় ফাঁস বানালো বাশেভিস। ফাঁসটা পরালো গজালে। তারপর দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে মাটিতে নামলো ও।

ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বাবা বললেন, 'বাশেভিস, ঈশ্বর আমাদের জন্য অনেক করেছেন। কিন্তু কাল সকালে কি হবে?'

'কিচ্ছু না। চুপচাপ থাকো।'

সারাদিনের ঘটনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বাশেভিস। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে, ক্যাম্পের গেট ভর্তি হয়ে গেল পুলিস আর সৈনিকে। দ্বিতীয় গার্ড জালমান স্বীকার করলো গতরাতে গেটে ও ছিলো না। ক্রাকোভ শহরে ফুর্তি করেছে এক বেশ্যালয়ে। লিয়ারের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ও জানালো,

লিয়ারের অনেক মেয়ে-বন্ধু আছে, মাঝেমাঝেই ও ওদেরকে নিয়ে গায়েব হয়ে যায়।

লিয়ারের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়লো পুলিস। এদিকে গেটের তালা বন্ধ। তার মানে গেটে কোনো হাঙ্গামা হয়নি। অর্থাৎ লিয়ারের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে ক্যাম্পের মানুষদের কোনো সম্পর্ক নেই।

জালমানকে গ্রেপ্তার করা হলো। দুজন নতুন গার্ড বসিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে দেয়া হলো গেট।

বিকেল পাঁচটায় ঘুম ভাঙলো বাশেভিসের। চোখ খুলতেই আসিমভের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর।

'আসিমভ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'কাশি বন্ধ হয়ে গেছে। অলৌকিক কাণ্ড। শিগগির চলো।'

আসিমভের বাবা বিছানায় বসে আছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ। বাশেভিসকে জড়িয়ে ধরে অনেক আশীর্বাদ করলেন।

খবরটা ঝড়ের মতো ছড়িয়ে পড়লো ক্যাম্পে।

ডা. আইজাক সিঙ্গারের সঙ্গে দেখা করতে গেল বাশেভিস।

'ওয়েল কাম মাই বয়, এবার আমি পরীক্ষা করবো,' বাশেভিসকে জড়িয়ে ধরে বললেন ডাক্তার।

'বাশেভিস, আমি আর থাকতে পারছি না। কবে আমাদের বিয়ে হবে,' ফেরার সময় ওকে পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বললো গোল্ডা।

ওর লাল রিবনের গিঁট খুলে দিয়ে বাশেভিস বললো, 'গোল্ডা, বিয়ে আমাদের হয়েই গেছে। এখন শুধু একত্রে থাকা বাকি।'

'যা, দুষ্টু।' লজ্জায় লাল হয়ে ভেতরে দৌড় মারলো গোল্ডা।

* নিজের একজন রোগীর ওপর বাশেভিসের সেরাম প্রয়োগ করলেন ডা. সিঙ্গার। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উঠে বসলো রোগী।

বাশেভিসের আস্তাবলে এলেন ডা. সিঙ্গার। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার উপায় নেই। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পবাসী। সবাই ওর ম্যাজিক সেরাম চায়। কিন্তু অতো সেরাম তৈরি করা ওর একার পক্ষে অসম্ভব। তবু দিনরাত খাটছে ও।

কোনরকমে ভিড় ঠেলে বাশেভিসের কাছে পৌঁছুলেন ডা. সিঙ্গার। একমনে কাজ করছে বাশেভিস। কতো কথা মনে পড়লো ডাক্তারের।

'বাশেভিস।'

'ডাক্তার সিঙ্গার,' মুখ তুলে বললো বাশেভিস।

'না, না, আমি আর ডাক্তার নই। আমি তোমার গর্বিত শ্বশুর। এখন বলো যৌতুকের জন্যে কি চাও?'

'কয়েকটা ঘোড়া।'

১৮৬৮ সালে সেই হলো শুরু মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স-এর।

বাশেভিসের সঙ্গে বিয়ে হলো গোল্ডার। যৌতুক হিসেবে বাশেভিস পেলো ছয়টা ঘোড়া, এবং যন্ত্রপাতিসহ একটা ল্যাবরেটরী। শুধু সেরাম আর ভ্যাকসিন নয়, গবেষণার পরিধি আরো বাড়ালো বাশেভিস। গাছগাছড়া থেকে ওষুধ বানাতে লাগলো ও। বাড়তে থাকলো ওর সুনাম।

একদিন গোল্ডাকে বাশেভিস বললো একটা ওষুধের দোকান খুলতে যাচ্ছে ও।

প্রথম থেকেই জমে উঠলো সেই দোকানের ব্যবসা। বড়লোকরা ওর ব্যবসার পার্টনার হতে চাইলো। মোটা টাকাও অফার করলো ওরা। লোভ দেখালো, 'একটা দোকান নিয়ে কি করবে? আমাদের সঙ্গে নাও অনেক দোকান খুলতে পারবে।'

কিন্তু রাজি হয় না বাশেভিস। গোল্ডাকে যুক্তি দেখালো, 'পার্টনার নিতে আমার ভয় করে। এটা শুধু তোমার আমার ব্যবসা। আমি চাই না এতে অন্য

কেউ ভাগ বসাক।'

কোনো তর্ক না করে সম্মতি জানালো গোল্ডা মেয়ার।

পার্টনার ছাড়াই বাড়তে থাকলো বাশেভিসের ব্যবসা, সেই সঙ্গে দোকানের সংখ্যা। আরো বেড়ে গেল টাকা দেয়ার প্রস্তাব। কিন্তু বাশেভিস নিজের সিদ্ধান্তে অটল।

ডা. আইজাক সিঙ্গারও একদিন কারণটা জানতে চাইলেন।

'বাবা, শেয়াল যতোই বন্ধুতা দেখাক, মুরগীর খাঁচায় তাকে ঢুকতে দিতে নেই। একদিন না একদিন শেয়ালের খিদে পাবেই,' যুক্তি দেখালো বাশেভিস।

শুধু ব্যবসাই নয়, বাশেভিস আর গোল্ডার দাম্পত্যজীবনেও ঘটলো শ্রীবৃদ্ধি। পাঁচ–পাঁচটা পুত্র সন্তানের জন্ম দিলো গোল্ডা। আবেল, জোফ, লিও, বরিস, ওয়াল। প্রতি সন্তান জন্মের সময় একটা করে নতুন দোকান খুললো বাশেভিস। ওর কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ালো কয়েক ডজনে।

একদিন ক্রাকোভ শহর থেকে একজন সরকারি কর্মকর্তা এসে বাশেভিসকে জানালেন, সরকার ওর জন্যে আইন শিথিল করেছেন, ইচ্ছে করলে ও ক্রাকোভ শহরে ব্যবসা শুরু করতে পারে।

এ সুযোগের অপেক্ষায় জীবনের অনেক প্রহর গুনেছে বাশেভিস। স্বাধীনতা, খোলামেলা জায়গা, ফুলের বাগান, সুন্দর বাড়ি।

ক্রাকোভ শহরে দোকান খুললো বাশেভিস। তিন বছরের মাথায় বিল্ডিঙ উঠলো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের। একটা সুন্দর বাড়ি কিনলো গোল্ডার জন্যে।

ছোটবেলার সবগুলো স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বাশেভিসের। ডাক্তার হওয়া,

গোল্ডাকে পাওয়া, ক্যাম্পের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি। কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এবং তার পরিধি শুধু ক্রাকোভ শহরে সীমাবদ্ধ নয়। ওর কল্পনা এখন ডানা মেলেছে সমস্ত পৃথিবীতে।

ছেলেরা বড় হচ্ছে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা গৃহশিক্ষক রেখে

একেকজনকে একেকটা বিদেশী ভাষা শেখাতে লাগলো বাশেভিস। আবেল আর জোফকে ইংরেজী, লিওকে জার্মান, বরিসকে ফরাসী, এবং ওয়ালকে ইটালিয়ান।

পনেরো বছর বয়সে পা দিলেই ছেলেদের বিদেশ ঘুরিয়ে আনে বাশেভিস। আবেলকে আমেরিকা, জোফকে ইংল্যাণ্ড, লিওকে জার্মানী, বরিসকে ফ্রান্স এবং ওযালকে ইটালী। প্রতিটি যাত্রায় ওইসব দেশে বাশেভিস ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চারা রোপণ করে এলো।

আবেলের একুশ বছর বয়সে পরিবারের সবাইকে ডেকে বাশেভিস ঘোষণা করলো, 'আবেল আমেরিকা যাচ্ছে। ওখানেই থাকবে ও।'

ডা. সিঙ্গার এবং মিসেস সিঙ্গার প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। গোল্ডা তাঁদের সবকিছু বুঝিয়ে বললো। শেষে মত দিলেন তাঁরা।

আবার কথা শুরু করলো বাশেভিস। 'আবেল, তুমি ন্যু ইয়র্কে একটা ফ্যাক্টরী খুলবে। সেটার মালিকও হবে তুমি।'

'তোমার কথামতোই সব হবে, বাবা,' গর্বের সঙ্গে বললো আবেল।

জোফের দিকে তাকিয়ে বাশেভিস জানালো, 'একুশ বছর বয়সে তুমি যাবে লণ্ডনে, ঠিক আছে?' মাথা নাড়লো জোফ।

'বাবা, একুশ বছর বয়সে নিশ্চয় আমি বার্লিনে যাচ্ছি,' জানতে চাইলো লিও। মাথা দোলালো বাশেভিস।

'তাহলে আমি যাচ্ছি প্যারিসে!' কৌতূহল দমন করতে না পেরে বললো বরিস।

'হ্যাঁ।'

'বুঝেছি, তোমরা আমাকে রোমে পাঠাবে।' হাসতে হাসতে মন্তব্য করলো ওয়াল।

'ঠিক ধরেছো।'

পরের সাত বছরে পৃথিবীর পাঁচটা দেশে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের শাখা গড়ে উঠলো।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আরো দেশে, মহাদেশে। শুধু ওষুধ শিল্পে নয়, শিল্প সাম্রাজ্যের দিকে পা বাড়ালো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স।

ছেলেদের সাফল্যে খুশি এবং গর্বিত বাশেভিস, গোল্ডা। কিন্তু এটা তো ব্যবসার এক পিঠ। উল্টো পিঠে আছে জটিলতা; আইন, অংশীদারিত্বের প্রশ্ন। সে ব্যাপারেও সচেতন ওরা। অ্যাটর্নি ডেকে শেয়ার বন্টনের দলিল তৈরি করতে বললো বাশেভিস। 'এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। শেয়ার পরিবারের মধ্যেই থাকবে। শেয়ারের বড় অংশ থাকবে আমার বড় ছেলে এবং তার উত্তরাধিকারীদের হাতে। যদি কখনো শেয়ার বিক্রির প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় মেয়ার পরিবারের যারা থাকবে তাদেরকে ঐকমত্যে পৌছুতে হবে।'

ঘুরতে থাকলো শতাব্দীর চাকা।

আবেল বিয়ে করলো আমেরিকান মেয়ে। ওদের ঘরে জন্মালো বাশেভিসের প্রথম নাতি, আব্রাহাম। আব্রাহামের ঔরসে জন্মালো ডেভিড মেয়ার, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের বর্তমান ম্যানেজি‌ং রেক্টর। ডেভিডের একটি মা কন্যা, ট্রেসি মেয়ার।

জোফ বিয়ে করলো ইংরেজ মেয়ে। ওদের একমাত্র কন্যা বিয়ে করে একজন ব্যারোনেটকে। তাদের ঘরে জন্মায় রিচার্ড। স্যার রিচার্ড, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্য, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ডিরেক্টর।

লিও বিয়ে করে জার্মান মেয়ে। ওদের ঘরে জন্মায় এক পুত্র আর এক কন্যা। পুত্রের ঔরসে জন্মায় একমাত্র কন্যা, স্টেফি। স্টেফি বিয়ে করে এক জার্মান বৈমানিককে। নাম বাওয়ার। বর্তমানে ও মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের একজন ডিরেক্টর।

বরিস বিয়ে করে ফরাসী মেয়ে। ওদের ঘরে দুজন পুত্র সন্তান জন্মায়। একজন আত্মহত্যা করে। অন্যজন বিয়ে করে। তার একমাত্র কন্যা লিজি। লিজি অনেক কয়েকবার বিয়ে করেছে। কিন্তু কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। বর্তমান স্বামী ভাদিম। উকিল। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের একজন ডিরেক্টর।

ওয়াল বিয়ে করে ইটালিয়ান মেয়ে। ওদের ঘরে জন্মায় দুজন সন্তান, একজন মেয়ে একজন ছেলে। ছেলের ঔরসে জন্মায় একমাত্র কন্যা, সোফিয়া। সোফিয়া বিয়ে করে একজন স্থপতিকে, নাম কার্লো। বর্তমানে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের একজন ডিরেক্টর।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের বর্তমান হেড অফিস জুরিখ।

এক

ট্রেসি মেয়ার। মাল্টি-বিলিয়ন-ডলার মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ফার্মাসিউটিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেভিড মেয়ারের একমাত্র মেয়ে। কিন্তু ট্রেসি জন্মেছে এক জোড়া দুর্ভাগ্য নিয়ে। জন্মের সময় ওর বাবার জীবনে সূচনা করেছে দুটো বিয়োগান্ত নাটক। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই ট্রেসি খুন করেছে ওর মাকে অপারেশন টেবিলে, তার ওপর জন্মেছে মেয়ে হয়ে।

মায়ের অন্ধকার গর্ভ থেকে পৃথিবীর মাটিতে আসার আগের ন'মাস ট্রেসি ছিলো ওর বাবার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত শিশু, এক বিশাল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শেয়ারটির উত্তরাধিকারী। কিন্তু জন্মেই সবকিছু হারালো ও। ডেভিড মেয়ার উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ছেলের জন্যে, তার উত্তরাধিকারীর জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ট্রেসি জন্মালো মেয়ে হয়ে।

ট্রেসির মা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। অনেক রমণী বিয়ে করতে চেয়েছে ডেভিড মেয়ারকে তাঁর টাকা, তাঁর নামের জন্যে। কিন্তু ট্রেসির মা হেলেন তাঁকে বিয়ে করেছিলেন ভালোবেসে। বিয়ের পর নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন হেলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সংসারে মন দেবার মতো সময় ছিলো না ডেভিড মেয়ারের। হেলেনের মনে হয়েছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো ভালোবাসা নেই।

মিসেস হেলেনের ভূমিকা হলো একজন আদর্শ গৃহিনির। স্বামীর কাছ থেকে কোনো ভালোবাসা পায়নি সে, একসময় সে-ও শিখলো না দিতে।

কিন্তু মিসেস হেলেন গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বদলে গেল। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স সাম্রাজ্যে ডেভিড হচ্ছেন মেয়ার রক্তধারার শেষ পুরুষ উত্তরাধিকারী। স্ত্রীকে আবার পাগলের মতো ভালোবাসতে আরম্ভ করলেন ডেভিড মেয়ার। হেলেন তখন চব্বিশ ঘন্টা স্বামীর সঙ্গে। আজ এ শহরে কাল ও শহরে, বেশির ভাগ সময় আকাশে; ডেভিড মেয়ার স্ত্রীকে শোনাচ্ছেন মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা। ডেভিড মেয়ার ধরে নিয়েছেন হেলেন তাঁকে ছেলে উপহার দিতে যাচ্ছে।

মিসেস্ হেলেনের মনে হলো রাতারাতি রানী হয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু নয় মাস পর অপারেশন টেবিলে সবকিছু ভেঙে গেল।

অপারেশন টেবিলে মারা গেলেন মিসেস হেলেন, মৃত্যুটা তার জন্যে এক ধরনের সান্ত্বনা। মরার সময় জেনে যেতে পারেননি ডেভিড মেয়ারকে ঠকিয়ে গেছেন তিনি।

হেলেনকে হারিয়ে তার ওপর মেয়ে পেয়ে আবার বদলে গেলেন ডেভিড মেয়ার। নিজের ব্যস্ত সময় থেকে কিছুটা কেটে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে স্ত্রীর শেষকৃত্য উপস্থিত থাকলেন তারপর শিশু কন্যার দেখাশোনার সমস্যাগুলোর ব্যবস্থা করলেন দ্রুত।

জন্মের এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আনা হলো ট্রেসিকে। একজন গভর্নেস ওর দায়িত্ব নিলো। তাকে সাহায্য করার জন্যে নিয়োগ করা

হলো এক ডজনেরও বেশি আয়া। এরপর শুরু হলো এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি, এক গভর্নেস থেকে অন্য গভর্নেস, আয়ার পর আয়া; এভাবে অনাথার মতো মানুষ হতে লাগলো এক বিশাল ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান।

প্রথম পাঁচ বছর বাবার দেখা খুব একটা পায়নি ট্রেসি। বাবাকে মনে হতো একজন পলাতক মানুষ। একজন আগন্তুক। বাড়িতে আসছেন আর যাচ্ছেন।

ট্রেসির জীবন কাটতে লাগলো ওদের বিভিন্ন বাড়িগুলোতে। কখনো লং আইল্যাণ্ড, কখনো বিয়ারিজ কখনো, সার্ডিনায়।

আমেরিকার লং আইল্যাণ্ডে ওদের বাড়িটা যেন একটা বিশাল স্টেডিয়াম। ক্রিকেট খেলার মাঠ, টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, স্কোয়াশ কোর্ট।

ফ্রান্সের বিয়ারিজ ভিলায় পঞ্চাশটা কক্ষ, তিরিশ একরের আঙ্গিনা। এখানে এলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ট্রেসি।

বিকমেনোর অ্যাপার্টমেন্টটা একটা বিশাল ডুপ্লেক্স পেন্টহাউস।

ইটালীর সমুদ্র উপকূল হতে একশো ষাট মাইল দক্ষিণ–পশ্চিমে সার্ডিনা–র মেরান্ডা উপকূল। তার তীরে পাহাড়ের মাথায় মেয়ার ভিলা।

ট্রেসির চারপাশে অর্থ, সম্পদ, বৈভব, আড়ম্বর, সৌষ্ঠব, পরিচ্ছন্নতা, প্রতিপত্তি...। কিন্তু এগুলোর ভেতর ও বড় হতে লাগলো একজন আগন্তুকের মতো। আর বড় হতে হতে ভালোভাবে বুঝতে পারলো ডেভিড মেয়ারের মেয়ে হবার অর্থ কি।

পারিবারিক জীবনের সামান্যতম স্বাদও পায়নি ট্রেসি। আসলে পরিবার বলে কোনকিছু ছিলো না ওদের। ও মানুষ হয়েছে পারিশ্রমিক নেয়া বিকল্প মা আর বাবাদের হাতে। নিজের বাবা অনেক দূরের মানুষ। ওর প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ট্রেসিকে সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যেতেন না ডেভিড মেয়ার। ভ্রমণের সময়

মালপত্র বেশি হলে মানুষ যেমন অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বাদ দিতে চায়, ডেভিড মেয়ারের কাছে ট্রেসি তেমনি এক বাড়তি বোঝা। মিসেস হেলেন পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু একটি ছোটো

মেয়ের জন্যে তা হয়ে দাঁড়ালো নিপীড়নের শামিল। যন্ত্রণাদায়ক।

বয়েস বাড়ার সাথে সাথে ট্রেসি অনুভব করলো ওকে কেউ চায় না, ভালোবাসে না। অথচ বুঝতেও পারছে না কেমন করে এই হতাশা থেকে মুক্তি পাবে। শেষে ও সব দোষ চাপালো নিজের ওপর। ভাবলো ও ভালোবাসা পাবার যোগ্য নয়।

মরিয়া হয়ে ট্রেসি বাবার মন জয় করার চেষ্টা আরম্ভ করলো। স্কুলে ভর্তি হবার পর বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ছবি আঁকা শুরু করলো। ছবিগুলো ওর কাছে মহামূল্যবান সম্পদ। সবসময় আগলে রাখে কেউ যেন দেখতে না পায়। ওগুলো ও এঁকেছে শুধু ওর ব্যস্ত বাবার জন্যে। হয়তো কোনো ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে ছবি দেখে তিনি বলবেন, 'ট্রেসি, মাই সুইট ডটার, ছবিগুলো সুন্দর হয়েছে। তুমি আসলে প্রতিভাবান।'

ডেভিড মেয়ার ফিরে এলে ট্রেসি ওর ভালোবাসার নৈবেদ্য তার চোখের সামনে মেলে ধরে। তিনি অন্যমনস্কের মতো ছবিগুলো দেখেন। তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে বলেন, 'ট্রেসি, তুমি কি কখনো শিল্পী হবে? হবে না, তাই না?'

মাঝে মাঝে ট্রেসি মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ওদের বিকমেন পেন্টহাউসের সিঁড়ি ভেঙে দীর্ঘ হলওয়ে পেরিয়ে ওর বাবার কাজ করার ঘরটায় ঢোকে। শূন্য ঘরে ঢোকার সময় ওর মনে হয় যেন কোনো তীর্থ স্থানে ঢুকছে। 'এটা আমার কোটিপতি বাবার ঘর। এখানে তিনি কাজ করেন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রে সই করেন। পৃথিবীটাকে পরিচালনা করেন।'

বাবার ডেস্কের দিকে ভীরু ভীরু পায়ে এগোয় ও। বসে পড়ে চামড়ার গদিঅলা চেয়ারে। এখানে বসেই তিনি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স চালান।

চেয়ারে বসতেই ট্রেসি অনুভব করে বাবার অনেক কাছে চলে এসেছে ও। বাবাকে পুরোপুরি দখল করে ফেলেছে। কল্পনায় বাবার সঙ্গে আলাপ শুরু করে ও। গভীর মনযোগ এবং আগ্রহের সাথে ওর কথা শুনতে থাকেন ডেভিড মেয়ার। এবং ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন।

এক রাতে অন্ধকারে বাবার ওই চেয়ারে বসে আছে ট্রেসি, হঠাৎ জ্বলে উঠলো ঘরের বাতি। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ডেভিড মেয়ার। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন তিনি।

'ট্রেসি, অন্ধকারে বসে কি করছো?'

লজ্জায় এবং বাবার হাতে ধরা পড়ার গ্লানিতে কোনো উত্তর দিতে পারলো না ট্রেসি। মাথা নামালো। কাঁদছে।

ভেতরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে ট্রেসিকে কোলে তুলে নিলেন ডেভিড মেয়ার, বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাত বুলালেন মেয়ের মাথায়। ঘুমের ভান করে পরে রইলো ট্রেসি। বাবা চলে গেলেন। সারারাত ঘুমোতে পারলো না ও। বাবা ওকে কোলে নিয়ে হাঁটছেন, কেবল ওই দৃশ্যটাই ভাসছিল ওর চোখে।

এরপর অনেকদিন প্রতিরাতে বাবার অফিস ঘরে ঢুকে সেই বিশেষ চেয়ারটায় বসেছে ট্রেসি। চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করেছে, বাবা আসবে, ওকে কোলে নেবে। কিন্তু আশা আশাই থেকে গেছে, ওই ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হয়নি।

মা-র কোনো কথাই কারো কাছ থেকে শোনেনি ট্রেসি। শুধু রিসেপশন হলে ঝোলানো তার পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবিটা দেখেছে। কী সুন্দর! চোখ ফেরাতে পারে না ও। ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকে। আর আয়নায় দেখা ওর চেহারা তখন কুৎসিত মনে হয় ওর কাছে। দাঁতগুলো উঁচু উঁচু। মুখটা ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা। ট্রেসির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো এজন্যেই বাবা ওকে ভালোবাসে না।

তারপর থেকে স্বভাব পাল্টালো ওর। আগে বেশি খেতে চাইতো না। হঠাৎ রাতারাতি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মতো ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো ও। গোগ্রাসে গিলতে লাগলো সবকিছু। এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল ও। একসঙ্গে মোটা এবং ওজন বাড়াতে হবে। তাহলে কেউ আর ওকে ওর মা-র সঙ্গে তুলনা করবে না। হয়তো তাহলেই ওর বাবার দৃষ্টি পড়বে ওর ওপর।

বারো বছর বয়সে ট্রেসিকে ভর্তি করা হলো ম্যানহাটান-এর পুবে এক

প্রাইভেট স্কুলে। শুধু সৌভাগ্যবানদের ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। ওকে স্কুল যাওয়া-আসা করতে হয় রোলস-রয়েস গাড়িতে। গাড়ি চালায় শোফার।

ক্লাসে চুপচাপ বসে থাকে ট্রেসি। কারো সঙ্গে কথা বলে না। বক্তৃতা শোনে না। সবাইকে অবহেলা করে। কোনো ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। কখনো প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিতে পারে না, দেবার চেষ্টাও করে না। শিক্ষিকারাও ওকে অবহেলা করতে আরম্ভ করলেন। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, ট্রেসি অহঙ্কারী, বড়লোকের বখাটে মেয়ে। বার্ষিক রিপোর্টে প্রধান শিক্ষিকা লিখলেনঃ

'ট্রেসির লেখাপড়ার ব্যাপারে আমরা কোনো সাহায্য করতে পারবো না। ক্লাসে ও কারো সঙ্গে মেশে না। এখানে ওর কোনো বন্ধু নেই। লিখিত পরীক্ষাগুলোর ফলাফল সন্তোষজনক নয়। কিন্তু আমরা ওর অপারগতার কারণ বুঝতে পারছি না। ও কি সত্যি পড়ার বিষয়গুলো বোঝে না, নাকি না বোঝার ভান করছে? ও অহঙ্কারী এবং খেপা। ওর বাবা এই স্কুলের একজন প্রধান দাতা না হলে আমরা ওকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করতাম।'

প্রধান শিক্ষিকার দ্বিতীয় সন্দেহটা সত্যি। আসলে ট্রেসি না বোঝার ভান করতো। নির্জনতা এবং নিসঙ্গতা ওকে খেপা বানিয়েছে। কাউকে বন্ধু করতে ও ভয় পায়। যদি ওরা ওর গোপন কথাটা জেনে যায়? ওকে যে কেউ ভালোবাসে না, ও যে অপদার্থ, এ কথা যদি কেউ জেনে যায়?

ট্রেসি অহঙ্কারী নয়। লাজুক। ভীরু। ও বুঝেছে পৃথিবীতে ওর জন্যে কোনো ভালোবাসা নেই, বাবাকে কখনোই পাবে না ও। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয় ওর কাছে।

রোলস-রয়েস গাড়িতে চড়তে ওর ভালো লাগে না। ট্রেসি মনে করে ও এইসব প্রাচুর্যের যোগ্য নয়। ক্লাসে শিক্ষিকাদের প্রশ্নের উত্তর ও জানে, কিন্তু কথা বলতে চায় না, ওর দিকে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায় না। পড়তে ও খুব ভালোবাসে। কখনো পড়তে পড়তে সারারাত জেগে থাকে।

বাবাকে নিয়ে অনেক দিবাস্বপ্ন দেখে ট্রেসি।...বাবা ওকে প্যারিসে বেড়াতে নিয়ে গেছেন। একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে ওরা পৌঁছুলো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের প্যারিস শাখায়। বাবার অফিসটা একটা বিশাল গির্জার মতো। কর্মকর্তারা আসছেন আর আসছেন কাগজপত্র সই করাতে। বাবা সবাইকে বিদায় করে দিচ্ছেন আর বলছেন, 'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, আমি ব্যস্ত? আমি আমার ট্রেসির সঙ্গে কথা বলছি।' ...বাবার সঙ্গে ও স্কি করছে সুইজারল্যাণ্ডে। একটা খাড়া ঢাল বেয়ে নামার সময় পা পিছলে পড়ে গেলেন বাবা। ককিয়ে উঠলেন ব্যথায়। একটা পা ভেঙে গেছে। ট্রেসি বললো, 'বাবা, ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সেবা করবো।' ...হাসপাতালে বাবাকে খাওয়াচ্ছে ট্রেসি। এমন সময় একজন নার্স ডেভিড মেয়ারকে ওষুধ খাওয়াতে ঢুকলো। বাবা ওকে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'সিস্টার, আপনি একটু পরে আসুন। দেখছেন না, আমার ট্রেসি আমাকে খাওয়াচ্ছে।' ...সার্ডিনায় গ্রীষ্ম কাটাতে গেছে ওরা। বাবুর্চিকে রান্না করতে না দিয়ে নিজেই সব রান্না করলো ট্রেসি। ডাইনিং টেবিলে সবকিছু গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বাবা ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,' ট্রেসি, তুই তোর মা-র থেকেও ভালো রান্না জানিস' ...বিকমেনে ওদের পেন্টহাউসে ঢুকে একদিন এক সুদর্শন যুবক ওর বাবাকে অনুরোধ করলো, 'মি. মেয়ার, আমি ট্রেসিকে বিয়ে করতে চাই।' বাবা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষা চাইলেন,' ট্রেসি, মা আমার, আমাকে ছেড়ে যাস না। তোকে আমার অনেক প্রয়োজন।' ট্রেসি যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি এখন আসতে পারেন। শুনলেন না, আমার বাবা কি বললো?'

কিন্তু ওর দিবাস্বপ্নগুলো ভেঙে যায় সেই একই হৃদয়বিদারক দৃশ্যে। তাড়াহুড়ো করে বাবা ঢুকছেন বাড়িতে আর ওকে হ্যালো বলতে না বলতেই বেরিয়ে যাচ্ছেন আবার।

সার্ডিনার ভিলাটা সবচেয়ে ভালো লাগে ট্রেসির। পাহাড় ঘেরা দ্বীপ। নিচে সমুদ্র। চারপাশে জলপাইয়ের বাগান। পাথরের বাড়ি। মেয়ার ভিলাও পাথরের।

তিনতলার ওপরে টাওয়ার রুম। ছাদটা ঢালু। ডেভিড মেয়ার এটাকে

ব্যবহার করেন তাঁর অফিস হিসেবে। দেয়াল জুড়ে বুকসেলফ। এখানেই ট্রেসি পনেরো বছর বয়সে আবিষ্কার করলো বাশেভিস মেয়ারের জীবনী। পড়তে পড়তে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো ও। কিন্তু বইটা সার্ডিনায় পড়া শেষ করতে পারলো না ও, তার আগেই ওকে ফিরতে হলো লং আইল্যাণ্ডের বাড়িতে।

সার্ডিনার মিষ্টি-মিষ্টি শীতের পর ন্যু ইয়র্ককে মনে হচ্ছিলো উত্তপ্ত সাইবেরিয়া। কিন্তু ট্রেসির মন পড়ে আছে পোলাণ্ডে, আরেক শতাব্দীতে, পিতৃপুরুষ বাশেভিস মেয়ারের রোমাঞ্চকর অভিযানে। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে নিজের ঘরে ছুটে যায় ও, দরজা বন্ধ করে পড়তে থাকে বইটা।

বই পড়া শেষ করে কিশোর বাশেভিস মেয়ারের সঙ্গে নিজের এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পেলো ট্রেসি। বাশেভিস ছিলো ওর মতোই নিঃসঙ্গ। বাশেভিসের মতো বুকের ভেতর গুমরে ওঠা কথাগুলো বলার লোক পায় না ও।

কিন্তু বাশেভিসের জীবন ওকে যোগালো এক ধরনের সাহস এবং সান্ত্বনা। যা ট্রেসি আগে কখনো অনুভব করেনি। নিজেকে আর অতো অপদার্থ মনে হচ্ছে না ওর।

কলেজে ব্যালে নাচের ক্লাসটা সবচেয়ে খারাপ লাগে ট্রেসির। হঠাৎ একদিন ওদের নাচের শিক্ষিকা জানালেন, দু'সপ্তাহ পর কলেজে বার্ষিক নাচের উৎসব হবে। ছাত্রীদের তিনি অনুরোধ করলেন, ওদের বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানাতে। ট্রেসির বয়েস তখন বিশ।

নাচের শিক্ষিকার কথা শুনে আতঙ্কে, উদ্বেগে দিশাহারা হয়ে পড়লো ট্রেসি। একে তো অডিটোরিয়ামে অতগুলো মানুষের সামনে নাচতে হবে, তার ওপর সবার বাবা-মা উপস্থিত থাকলেও ওর বাবা থাকবেন না। এর আগে কলেজের অনেক অনুষ্ঠানে বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ও। কিন্তু ওর ব্যস্ত বাবা কখনোই সময় করে উঠতে পারেননি।

দুশ্চিন্তায় দিন কাটতে লাগলো ট্রেসির। বাবার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হলেও কথাটা জানায়নি ও। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

অবশেষে এলো সেই বিশেষ দিন; ট্রেসি মনে মনে কামনা করেছে দিনটি আসার আগেই ওর যেন এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাতে ওকে অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়। দেখতে দেখতে দিন গড়ালো অপরাহ্নে। নাচের পোশাক পরতে আরম্ভ করলো ট্রেসি।

প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে যাবে ট্রেসি এমন সময় ফিরলেন ডেভিড মেয়ার।

'হ্যাল্লো, ট্রেসি।'

'হ্যালো, ড্যাড।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

'কলেজে।'

'কলেজে! এখন! কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান?'

'হ্যাঁ। আমাদের ব্যালে নাচের বার্ষিক উৎসব।'

'আমি আসতে পারি?'

'বাবা!' বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে ট্রেসি।

"আমার যেতে বাধা আছে? তাহলে থাক।'

'না। তুমি আমন্ত্রিত। আমি বলবো বলবো করে ভুলে গেছি।'

'অল রাইট। এক মিনিট। আমি কাপড় বদলে আসছি।'

এমন মানসিক আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না ট্রেসি। মুহূর্তে গোটা জীবনটা যেন পাল্টে গেছে ওর। বাবার সঙ্গে স্কুলের অডিটোরিয়ামে কেমন করে কখন পৌঁছুছে ভালোভাবে মনে নেই।

অডিটোরিয়াম মানুষে ভর্তি। স্টেজের দু'পাশে দুটো বিশাল পিয়ানো। এক কোণে নাচের শিক্ষিকা ম্যাডাম বোভারি। এক এক করে ছাত্রীদের নাম ধরে ডাকছেন স্টেজে আসার জন্যে। নাচের নির্ধারিত সময় দু'মিনিট।

সবাই ভালো নাচছে। পড়ছে করতালি। ভয়ে সিঁটকে আছে ট্রেসি। একসময় ওর নাম ডাকলেন ম্যাডাম বোভারি। ঘোরের মধ্যে স্টেজে উঠলো ও।

পিয়ানো বাজছে। স্টেজে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি। ভুলে গেছে নাচের

ছন্দ। হতবাক হয়ে গেছে দর্শক। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মাথার চুল ছিঁড়ছেন ম্যাডাম বোভারি। কিন্তু পাথর হয়ে আছে ট্রেসি। চোখ নামানো। তুলতে সাহস পাচ্ছে না যদি বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হয়!

পিয়ানো বাজছেই। কেটে যাচ্ছে সময়। হঠাৎ কে যেন কথা বলে উঠলো ট্রেসির ভেতর, 'ট্রেসি, এ কি করছো? নাচো। আমি বাশেভিস। তুমি আমার রক্তের অংশ। আমার রক্তে পরাজয় বলে কোনো শব্দ নেই।'

শতাব্দীর ওপার হতে একটা ঝড়ো হাওয়া এসে কাঁপিয়ে তুললো ট্রেসির পা দুটোকে। নিজের শরীর থেকে আলগা হয়ে গেল ওর শরীর। নাচতে আরম্ভ করলো ট্রেসি।

নাচছে ট্রেসি। পেরিয়ে গেছে নাচের নির্ধারিত সময়। থেমে গেছে পিয়ানো। তবুও নাচছে ও। স্টেজ থেকে ওকে চলে যাবার জন্যে বারবার ইঙ্গিত করছেন ম্যাডাম বোভারি। লজ্জায় মাথা হেঁট করেছেন ডেভিড মেয়ার। কিন্তু বর্তমানের কোনকিছুই প্রভাবিত করতে পারছে না ট্রেসিকে। ও উড়ে গেছে শতাব্দী পেরিয়ে ক্রাকোভ শহরের পাঁচিল ঘেরা সেই ক্যাম্পে যেখান থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এক দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিল কিশোর বাশেভিস।

ট্রেসির কাণ্ড দেখে বিভ্রান্ত হয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেললো পিয়ানো বাদকরা। ইতস্তত করতে করতে সুর তুললো প্রথমজন। একটু পর ওর দেখাদেখি দ্বিতীয় জনও। আবার বাজতে লাগলো পিয়ানো।

পনেরো মিনিট পর থামলো ট্রেসি। তার অনেক আগেই অডিটোরিয়াম ছেড়ে চলে গেছেন ডেভিড মেয়ার।

পরেরদিন ডেভিড মেয়ারের সেক্রেটারী ট্রেসিকে জানালেন, সুইজারল্যাণ্ডের এক বোর্ডিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা হয়েছে ওকে।

নেউচাঁটেল হ্রদের পাড়ে, স্যাইন্টে-ব্লাইসে গ্রামে মেয়েদের বোর্ডিং ইউনি-ভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল চাঁটিউ লেমাণ্ড। ছাত্রীদের বয়স বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। সুইজারল্যাণ্ডের সুখ্যাত শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম নামী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান এই বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু ট্রেসির মনে হলো নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে ওকে। বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছেন বাবা। অথচ কোনো অপরাধ করেনি ও। সেই দুর্লভ সন্ধ্যায় স্টেজের ওপর বিজয়ের আনন্দে নাচছিল ও। মনে হয়েছে বাবাকে আবিষ্কার করতে যাচ্ছে ও, এবং বাবা ওকে, এবং ওরা দুজনে বন্ধু হতে যাচ্ছে। কিন্তু হলো তার উল্টো। আরো সুদূরে চলে গেলেন বাবা।

কিন্তু হতাশ হতে ভুলে গেছে ট্রেসি। অনেক পরে হলেও ও জেনেছে বাশেভিসের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ওর মধ্যে। বাশেভিসও প্রথম প্রচেষ্টায় বিজয় অর্জন করতে পারেনি। মরে গেছে লার্থা। পরে বাশেভিসকেও পাঠানো হয়েছিল একধরনের নির্বাসনে। গোল্ডাকে পাবার জন্যে ওকে সময় দেয়া হয়েছিল মাত্র ছয় মাস। তখন বাশেভিস জানতো না কিভাবে তা সম্ভব করবে ও; কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলো, ও পারবেই।

'আমাকেও পারতে হবে,' মনেমনে উচ্চারণ করে ট্রেসি।

হস্টেলে এক রুমে দু থেকে তিনজন ছাত্রী থাকে। তবে ট্রেসির সে ঝামেলা নেই, ওর একা এক রুমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ও। কারো সঙ্গে মেশার ইচ্ছা ওর নেই। কাউকে জানাতে চায় না বাবার সঙ্গে ওর রহস্যময় সম্পর্কের কথা।

হ্রদের ওপারে ছেলেদের ভার্সিটি। দুই ভার্সিটির ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলে মন এবং দেহ দেয়ানেয়ার খেলা। আগে থেকেই ওরা দেখা করার জায়গা ঠিক করে রাখে। আর রাতের আঁধারে সেখানে মিলিত হয় চোরের মতো।

ট্রেসির সহপাঠিনীরা সবসময় ওইসব ছেলেদের গল্প করে। গল্প শুনতে শুনতে ট্রেসির মনে হয় ওদের ভার্সিটি একদল কামাতুর তরুণীর আখড়া। এবং ও সেই আখড়ার একজন বন্দিনী।

সহপাঠিনীরা ট্রেসিকে আমন্ত্রণ জানায় ওদের গোপন অভিসারে, এবং বিশেষ খেলাগুলোতে। কিন্তু ও সাড়া দিতে পারে না। এসব ওর কাছে মনে হয়

বিকৃতি। যৌনাকাঙ্ক্ষা ট্রেসিও অনুভব করে; সম্প্রতি সেই আকাঙ্ক্ষা ওর ভেতরে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে সেটাও অনুভব করছে, কিন্তু প্রেম ছাড়া যৌনতার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না ও। ওর কাছে যৌনতা মানেই প্রেম। যেমন গোল্ডার জন্যে বাশেভিসের, ডেভিড মেয়ারের জন্যে হেলেনের।

সে প্রেম করার সময় ওর এখনো আসেনি। কিংবা এমন কোনো পুরুষের দেখা পায়নি যাকে মনে হবে ওর বাবার চেয়েও শক্তিশালী। বাবাকে জয় করার আগে সবকিছুই ওর কাছে মনে হয় তুচ্ছ।

সহপাঠিনীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে ও বরং খোঁজখবর নেয় মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ইণ্ডাস্ট্রির। খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিনগুলোতে হরহামেশা খবর বেরোয় মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কিংবা ডেভিড মেয়ারের। খবর এবং ছবিগুলো কেটে নিয়ে ও একটা ফাইলে জমিয়ে রাখে।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। আগামীকাল ট্রেসির একুশতম জন্মদিবস। গত বিশটা জন্মদিনে একবারও ওর পাশে থাকেননি বাবা। কিন্তু তাই বলে জন্মদিবসের অনুষ্ঠান আটকে থাকেনি। প্রতিবারই ঘটা করে অনুষ্ঠান হয়েছে। ডেভিড মেয়ারের সেক্রেটারী তার কর্তার হয়ে ট্রেসিকে উপহার দিয়েছেন। ওর বাবা ব্যস্ত থাকায় আসতে পারছেন না বলে ক্ষমা চেয়েছেন। প্রতিবারই মহামূল্যবান উপহার পেয়েছে ট্রেসি, শুধু বাবাকে ছাড়া।

এবারের জন্মদিনে বাড়ি থেকে ও অনেক দূরে। অনুষ্ঠান হবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু উপহার একটা নিশ্চয় আসবে। ওর ব্যস্ত বাবা ওর জন্মদিনের কথা ভুলে গেলেও তার সেক্রেটারী সে ভুল করবেন না। কেননা সে ভুলের মাসুল তাকে দিতে হবে চাকরি খুইয়ে। এটা ভালো করে জানে ট্রেসি।

আগামীকাল একটা দামী উপহারের প্যাকেট আসবে ডেভিড মেয়ারের কাছ থেকে। ব্যস, এই ওর একুশতম জন্মদিনের অনুষ্ঠান। ঘুমোনোর আগে তাই ভাবলো ট্রেসি।

দুই

কবিতার ক্লাস চলছিল। এমন সময় ভার্সিটি সেক্রেটারীর সহকারী এসে ম্যাডামের হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে চলে গেল। ম্যাডাম ট্রেসির পাশে এসে ওর কানে কানে বললেন, 'ট্রেসি, তোমার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। সেক্রেটারীর রিসেপশন রুমে অপেক্ষা করছেন। তুমি ইচ্ছে করলে এখনি যেতে পারো কিংবা ক্লাসের পরে।

খুব একটা আগ্রহ দেখালো না ট্রেসি। ও ধরে নিয়েছে ডেভিড মেয়ারের তরফ থেকে কোনো কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী এসেছে ওর জন্মদিনের উপহার নিয়ে।

ক্লাসের পরে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেক্রেটারীর রিসেপশন রুমে ঢুকলো ট্রেসি। কিন্তু ঢুকতেই ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলো ও।

একটা ডেনিশ সোফায় বসে আছে হাসান জহির। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ডেভিড মেয়ারের পরও হচ্ছে প্রশাসনের সর্বময় কর্তা।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে নিয়ে অনেক খোশগল্প বেরোয় ম্যাগাজিনের পাতায়। সেগুলো পড়ে ট্রেসি জেনেছে, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স বর্তমানে যে বিশাল সাম্রাজ্যে রুপ নিয়েছে তাতে এ প্রতিষ্ঠানকে ডেভিড মেয়ার ছাড়া আর যে লোকটি সুষ্ঠুভাবে

পরিচালনা করতে পারবে তার নাম হাসান জহির। অথচ ও হচ্ছে বাইরের লোক। এমন খবরও পড়েছে ট্রেসি, ডেভিড মেয়ার ইণ্ডাস্ট্রির অনেক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হাসান জহিরের ওপর নির্ভর করেন। শুধু তাই নয়, ডেভিড মেয়ার হাসান জহিরকে ইণ্ডাস্ট্রির একজন ডিরেক্টর বানিয়েছেন; যদিও ওর কোনো শেয়ার নেই। বোর্ড অভ ডিরেক্টরদের সভায় উপস্থিত থাকে ও। এতে মেয়ার পরিবারের ডিরেক্টররা খুশি নয়। তাদের ধারণা, ডেভিড মেয়ারকে বশ করেছে হাসান জহির।

হাসান জহিরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও পড়েছে ট্রেসি ইণ্ডাস্ট্রির বার্ষিক প্রতিবেদনে। পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশের ছেলে ও। জন্মেছেও খুবই গরীব পরিবারে। কিন্তু শুধু নিজের মেধা দিয়েই আজ উঠে এসেছে এতো ওপরে।

ট্রেসিকে দেখে উঠে দাঁড়ালো হাসান জহির।

ভদ্রলোকের বয়েস কতো হবে? মনে মনে ভাবছে ট্রেসি। খুব বেশি হলে সাতাশ। এতো অল্প বয়সে এরকম একটা শিল্প-সাম্রাজ্য কেউ হাতের মুঠোয় আনতে পারে? কিন্তু ভদ্রলোকের মেধার কথাই কাগজের পাতায় শুধু পড়েছে ও; ছবি দেখে আন্দাজ করতে পারেনি, তার আরো একটা বাড়তি বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে ওর সৌন্দর্য, যাকে বলে পুরুষালি সৌন্দর্য।

প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা হবে হাসান জহির। চোখ দুটো কালো, মায়াবী; ওগুলো থেকে ঝিলিক মারছে বুদ্ধি। শক্ত চোয়াল।। শরীর খেলোয়াড়দের মতো, পেটানো। চুলও কালো, কোঁকড়া।

'কেন এসেছে ভদ্রলোক আমার কাছে,' দিশেহারার মতো ভাবছে ট্রেসি। বাবার সামনে দাঁড়ালে খেই হারিয়ে ফেলে ও। কিন্তু হাসান জহিরকে দেখে তার চেয়েও বেশি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। হাসান জহির আসা মানে ডেভিড মেয়ারের আসা, কিংবা কে জানে হয়তো তার থেকেও বেশি। 'কি এমন ঘটনা ঘটেছে আজ, যার জন্যে হাসান জহিরকে আসতে হয়েছে আমার মতো একজন অপদার্থের কাছে?'

আর একটু এগিয়ে এসে ট্রেসির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর চোখের ওপর চোখ

রেখে হাসান বললো, 'হ্যালো, মিস ট্রেসি।'

'হ্যালো, মি. হাসান।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি হল্যাণ্ড যাচ্ছি ইণ্ডাস্ট্রির কাজে। আসার সময় মি. মেয়ার জানালেন আজ আপনার জন্মদিন তাই...।'

'ওহ্,' অস্ফুট স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করলো ট্রেসি। তাহলে ব্যাপার এই! ওর ব্যস্ত বাবার হয়ে ইণ্ডাস্ট্রির কোনো বেতনভুক কোনো কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তার সেই পুরনো অজুহাত। কিন্তু তাই বলে হাসান জহির কেন? ডেভিড মেয়ারের চোখে হঠাৎ তার মেয়ে এতো দামী হয়ে উঠলো কবে থেকে?

হাসান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি নিজের চেহারা থেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে হতাশা। এমন নিঃসঙ্গ মানুষ আগে কখনো দেখেনি সে। হাসান নিজেও নিঃসঙ্গ, শুধু তাই নয়, পরিত্যক্ত। জন্মেছে এক নিঃস্ব পরিবারে। ছোটবেলায় হারিয়েছে বাবা, মা, ভাইবোন। কিন্তু তবু সব-হারানোর এতো প্রকট বহিঃপ্রকাশ আগে কারো চেহারায় দেখেনি ও। আবেগে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে চাইলো ও ট্রেসিকে।

'মিস ট্রেসি, বিশ্বাস করুন, মি. মেয়ার নিজেই আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ...'

'মি. হাসান, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করেছি। আপনার মতো একজন দামী মানুষ মিথ্যে কথাই বা বলতে যাবে কেন? আমি আপনার অনেক মহামূল্যবান সময় নষ্ট করেছি, দুঃখিত। এখন দয়া করে আমাকে যেতে দিন।'

যাবার জন্যে পা বাড়ালো ট্রেসি, কিন্তু কোনো 'না' শুনতে এখানে আসেনি হাসান। পিছন থেকে ডাক দিলো, 'ট্রেসি, প্লীজ, আমার কথা শুনুন। একজন রমণীর জীবনে বারবার একুশতম জন্মদিন আসে না। আজকের সুন্দর দিনটা নষ্ট করবেন না, প্লীজ। চলুন, বাইরে কোথাও যাই।'

'ধন্যবাদ, মি. হাসান। আপনার সহমর্মিতায় আমি আনন্দিত। আমার একুশতম জন্মদিন সত্যিই সার্থক হয়েছে। আপনার আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ।

কিন্তু আমার ক্লাস আছে। দুঃখিত, বিশ্বাস করুন।'

'সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না।। আমি আপনাদের সেক্রেটারীর কাছ থেকে আগেই অনুমতি নিয়েছি। আপনার আজ ক্লাস না করলেও চলবে। এখন চলুন।

'কোথায়?' নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে ট্রেসি। এর আগে কখনো কেউ ওকে এতো সম্মান দেখায়নি, এতো আপন করেও ডাকেনি।

'কোনো রেস্তোরাঁয়, যেখানে কিছুক্ষণ মন খুলে কথা বলা যাবে। আছে আপনার এমন কোনো প্রিয় রেস্তোরাঁ?'

অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ালো ট্রেসি। না। কোনো প্রিয় রেস্তোরাঁ ওর নেই। 'প্রিয়' বলে কোনো আভিজ্ঞতা নেই ওর জীবনে।

'ঠিক আছে, ভারটা তাহলে আমার ওপরই ছেড়ে দিন। আপত্তি নেই তো?'

আবার মাথা দোলালো ট্রেসি। কিন্তু এবারে উল্টো অর্থে।

একসঙ্গে হাসানের গাড়িতে উঠলো ওরা দুজনে।

গাড়ি এগোচ্ছে এয়ারপোর্টের দিকে।

'কিন্তু এটা তো এয়ারপোর্ট যাবার রাস্তা!' বিস্ময়ে জানতে চাইলো ট্রেসি। দিশেহারা ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে ওর। রাস্তাঘাট আগের চেয়ে অনেক ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে এখন।

'হ্যাঁ। আমরা এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'একজন সুন্দর রমণীর শ্রেষ্ঠতম জন্মদিনের জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে কোনো রেস্তোরাঁ নেই।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'প্যারিস। ম্যাক্সিমে। একুশতম জন্মদিন উদযাপনের ওটাই একমাত্র জায়গা।'

এয়ারপোর্ট থেকে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের নিজস্ব জেটবিমানে প্যারিসের উদ্দেশে আকাশে উড়লো ওরা।

*

আগে থেকেই ম্যাক্সিমের দোতলা রিজার্ভ করা ছিলো। দোতলায় পা দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো ট্রেসি। রেস্তোরাঁ রেস্তোরাঁ নেই, একটা হলঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সবখানে ওর একুশতম জন্মদিন মূর্ত হয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। দু'পাশে দশটা করে চেয়ার, আর একমাথায় একটা। টেবিলের ওপর দু'ধারে দশটা করে ফুলদানি, আর অন্যমাথায় একটা। প্রতিটি ফুলদানিতে একুশটি ফুলের একটা গোছা। গোছাগুলোর মধ্যে কোনো মিল নেই।

টেবিলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত একুশটি বার্থডে কেক। কেকগুলো একুশটি মোমবাতি দিয়ে ঘেরা। ছাদে উড়ছে একুশটি বেলুন।

মোমবাতির আলো ছাড়া ঘরে কোনো বাতি নেই। এক কোণে একটা গোলাকার ডাইনিং টেবিল। দুটো চেয়ার।

ডাইনিং টেবিলের দিকে যাবার জন্যে ট্রেসিকে ইঙ্গিত করলো হাসান।

ডিনার শুরু হলো মাশরুম দিয়ে। এরপর গলদা চিংড়ি, ইতালীর ম্যাকরনি, কমলার সসে ভেজানো হাঁস, ম্যাক্সিমের স্পেশাল সালাদ।...

এমন সুন্দরতম সন্ধ্যা ট্রেসির জীবনে আগে কখনো আসেনি। এর স্থপতি হাসান জহির। আর এজন্যেই অস্বস্তিতে ভুগছে ও। কোথায় কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে।

খেতে খেতে হঠাৎ থেমে পড়লো হাসান। ট্রেসির মনটা যেন স্পষ্ট পড়তে পারছে ও। তাই ভণিতা না করে মুখ খুললো হাসান।

'মিস ট্রেসি, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আজ আপনার ব্যাপারে, এতো আগ্রহ দেখাচ্ছি কেন? আপনি অনুমতি দিলে আমি সেটা সরাসরি বলতে চাই। শুনবেন?'

'মি. হাসান, তার আগে আমি জানতে চাই, সত্যিই আমার বাবা আপনাকে আমার জন্মদিনের কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বলুন। আমি শুনছি।'

'মিস ট্রেসি, আপনি হয়তো জানেন, মেয়ার রক্তধারার শেষ পুরুষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন আপনার বাবা। আপনি নিশ্চয় আরো জানেন, আপনাদের ইণ্ডাস্ট্রি একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। বাশেভিস মেয়ারের উইল অনুযায়ী তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উত্তরাধিকারীরা হবে এই প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তম শেয়ারের অধিকারী। অর্থাৎ তাদের হাতেই থাকবে ইণ্ডাস্ট্রির কন্ট্রোলিং শেয়ার। বর্তমানে আপনার বাবা ডেভিড মেয়ার হচ্ছেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু তার জীবনে একসঙ্গে দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এক, আপনার জন্মের সময় তিনি হারিয়েছেন স্ত্রী অর্থাৎ আপনার মা-কে; দুই, আপনি মেয়ে হয়ে জন্মেছেন।

'মিস ট্রেসি, প্লীজ, কিছু মনে করবেন না, আমাকে আমার কথা শেষ করতে দেন। আপনি ছেলে হলে মিঃ ডেভিড মেয়ার তাঁর স্ত্রী হারানোর শোক ভুলে যেতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, তা হয়নি। বাশেভিস মেয়ারের রক্তের ধারা আপনি জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। ডেভিড মেয়ারের পর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কন্ট্রোলিং শেয়ার কার হাতে যাবে, সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব এখন আপনার বাবার। তাঁর জীবিতকালে তিনি তা করতে পারলে ভালো, কিন্তু তা না হলে আইন অনুযায়ী কন্ট্রোলিং শেয়ার যাবে আপনার হাতে, অর্থাৎ আপনি হবেন মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের মেয়ার পরিবারের সর্বশেষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর সমস্যাটা এখানেই। আপনি যতদিন কুমারী থাকবেন ততদিন কন্ট্রোলিং শেয়ার মেয়ার পরিবারের হাতেই থাকবে; কিন্তু আপনি মেয়ে, এবং আপনি বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিতে প্রথমবারের মতো ঢুকবে বাইরের লোক। আপনার ছেলেমেয়েরা কন্ট্রোলিং শেয়ারের মালিক হতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে বাশেভিস মেয়ারের উইলে কিছু বলা নেই। সম্ভবত সেটা নির্ধারিত হবে তখন মেয়ার পরিবারের যাঁরা ডিরেক্টর থাকবেন তাদের সিদ্ধান্তের ওপর। তবে ঘটনা যাই ঘটুক, ডেভিড মেয়ারের পর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না; এটাই হচ্ছে নিয়তি। এটাকে আর বদলানো যাবে না। ডেভিড মেয়ার পর্যন্ত পৌঁছে বাশেভিস মেয়ারের স্বপ্নটা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেল। আপনি হয়তো

জানেন না, এ কারণে আপনার বাবা এক ধরনের পাপবোধে ভোগেন।

'মিস ট্রেসি, বাশেভিস মেয়ার মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে যতো ভালবাসতেন, ডেভিড মেয়ারের ভালবাসা তারচেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। ইচ্ছে করলে তিনি অনেক আগেই এ সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, এখনো পারেন, সবকিছু তাঁর হাতের মুঠোয় আছে, কিন্তু তবু তিনি তা করবেন না, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ভেঙে গেলেও না। কেন। জানেন?'

'আপনার এবং আপনার মা-র জন্যে।'

'আমার এবং আমার মা-র জন্যে!' অবাক হয়ে গেছে ট্রেসি।

'হ্যাঁ, মিস ট্রেসি। আপনার মা-কে প্রচণ্ড ভালবাসতেন ডেভিড মেয়ার। যাদের মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের মতো বিশাল ইণ্ডাস্ট্রি চালানোর অভিজ্ঞতা নেই, তারা ঠিক বুঝবে না এরকম একটা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালানো কতো কঠিন। সে কারণে অনেকে ভাবতে পারে এবং বিয়ের পর আপনার মা-রও হয়তো সে ধারণা জন্মেছিল, ডেভিড মেয়ার ইণ্ডাস্ট্রি ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। তা না হলে স্ত্রীকে হারানোর পর ডেভিড মেয়ার আরো অনেক বিয়ে করতে পারতেন এবং এখনো পারেন। বাশেভিস মেয়ারের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পুত্র-সন্তানের জন্যে ডেভিড মেয়ার অনেক কিছুই করতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করবেন না। করবেন না শুধু এজন্যেই নয় যে তিনি তার স্ত্রীকে ভালবাসেন; করবেন না এজন্যেও যে তিনি আপনাকে দারুণ রকমের ভালবাসেন।'

'আমাকে বাবা ভালবাসে!' বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে ট্রেসি। মনে হচ্ছে ওর সামনে বসা ভদ্রলোক মিথ্যা কথা বলছে এবং এমন মিথ্যাবাদী ও জীবনে কখনো দেখেনি।

'হ্যাঁ, মিস ট্রেসি। আপনি তাঁর প্রথম সন্তান; শুধু তাই নয়, হেলেন মেয়ারের একমাত্র সন্তান। আজ আপনাকে একটা সত্যি কথা বলছি। আপনার সামনে দাঁড়ালে ডেভিড মেয়ারের বুকে একসঙ্গে দুটো অনুভূতি কাজ করে—হারানোর এবং পাওয়ার। ডেভিড মেয়ার নিজেও জানেন না, আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ

করবেন। তিনি ভয় পান, আপনার সামনে তিনি হয়তো নিজেকে ধরে রাখতে পারবেন না, অস্বাভাবিক হয়ে পড়বেন; তাই তিনি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান।

'মিস ট্রেসি, আপনার জন্মদিনে ডেভিড মেয়ার ইণ্ডাস্ট্রির কোনো কাজ করেন না, আপনার মা-র কবরের পাশে গিয়ে কাঁদেন।'

'মিঃ হাসান জহির! আমি···।'

'হ্যাঁ, মিস ট্রেসি। আমি জানি আপনি কি ভাবছেন। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স আর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না। বাশেভিস মেয়ারের স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্যে আপনি দায়ী নন। এজন্যে দায়ী ডেভিড মেয়ারের নিয়তি। একে আর কেউ পাল্টাতে পারবে না।'

'আমি বাবাকে আবার বিয়ে করতে বলবো।'

'বলবেন না, প্লীজ। আর আমি আপনাকে যা বললাম সে কথাগুলোও কখনো ভুলে ডেভিড মেয়ারকে জানাবেন না। তিনি সাংঘাতিক দুঃখ পাবেন। হেলেন মেয়ারের একমাত্র সন্তানকে ডেভিড মেয়ার কখনোই তার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না। কিন্তু আর নয়, এবার চলুন ফেরা যাক।'

হস্টেলে পৌঁছুতে অনেক রাত হলো ট্রেসির। গাড়ি থেকে নামার সময় ওর হাতে একটা সুটকেস দিয়ে হাসান বললো, 'মিস ট্রেসি, আপনার জন্মদিনের উপহার।'

রুমে ঢুকে কাপড়চোপড় না পাল্টে সুটকেসটা খুললো ট্রেসি। ভেতরে দুটো প্যাকেট। একটা বড়, অন্যটা ছোটো। বড়টার মধ্যে একটা ফারকোট, ডেভিড মেয়ার পাঠিয়েছেন। ছোটটার ভেতরে একুশটি লাল রিবন, পাঠিয়েছে হাসান জহির। একটা কার্ডে লেখা ঃ 'একজন সুন্দরতম রমণীর সুন্দর দিনে।'
রিবন একুশটা, প্রতিটির রঙ লাল। সবগুলো রিবনই সিল্কের। তবে সিল্কের কাপড় আলাদা। সম্ভবত সারা পৃথিবী থেকে জোগাড় করা হয়েছে। কিন্তু শুধু লাল রঙ কেন? লাল রিবন ছাড়া অন্য রঙের রিবন কি হাসান জহির পছন্দ করে না?

ওর কি রিবন পড়া মেয়ে দেখতে খুব ভালো লাগে?

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো ট্রেসি। এবং বিভ্রান্তির মধ্যে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো গোল্ডা মেয়ারের ছবি। লাল রিবন পরতো সে। বাশেভিস তা পছন্দ করতো। তবে কি হাসান জহির ওকে ভালবাসে?

আরো বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো ট্রেসি। বাবাকে জয় করতে চেয়েছিল ও। কিন্তু তার আর কোনো প্রয়োজন হবে না। বাবা ওকে গভীরভাবে ভালবাসেন, সে কথা আজকেই শুনেছে ও।

কিন্তু প্রেম? ট্রেসি এমন কাউকে ভালবাসতে চেয়েছিল যে হবে ওর বাবার মতো শক্তিশালী কিংবা তার চেয়েও বেশি। ওই পুরুষকে কোথায় পাবে ও, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না ওর। সে পুরুষ আদৌ আছে কিনা তাও জানতো না সে। শুধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরকম কারো দেখা না পেলে নিজের মন কাউকে দেবে না।

আজ সে পুরুষের দেখা পেয়েছে ট্রেসি। হাসান জহির। ওর বাবার চেয়েও শক্তিশালী। এমন অসাধারণ পুরুষ আগে কখনো দেখেনি ও। আজকের আগে কেউ ওকে অতো সম্মান দেখায়নি, ওর মন বোঝার চেষ্টাও করেনি।

চোখ বন্ধ করে ট্রেসি উচ্চারণ করলো, 'হাসান, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। আমি তোমাকে ভালবাসি।' তারপর ডায়েরী খুলে ওর নাম ট্রেসি মেয়ার কেটে লিখলো, 'মিসেস হাসান জহির।'

ধীর পায়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ট্রেসি। হাসান কয়েকবার উচ্চারণ করেছে, ও সুন্দরী। হাসান মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল ট্রেসি। সত্যি, ও সুন্দরী। ওর মুখে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে ওর মা-র সৌন্দর্য। আগে তা দেখতে পায়নি ও।

পরের দিন থেকে খাওয়া কমিয়ে দিলো ট্রেসি। শুরু করলো হাল্কা ব্যায়াম। শরীর থেকে তাড়াতাড়ি কমিয়ে ফেলতে হবে মেদ।

তিন

ট্রেসির একুশতম জন্মদিনের তিনদিন পর।

ইস্তাম্বুল। শনিবার। ৫ই সেপ্টেম্বর। রাত দশটা।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের স্থানীয় শাখার সেলস ম্যানেজার হাফিজ সাদ্দামের অফিসে বসে আছে হাসান জহির। একা। ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে উদাসীনের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে শহরের প্রাচীন মিনারগুলো।

এক ঘন্টা আগে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। মারা গেছেন ডেভিড মেয়ার। ডেভিড মেয়ারকে মৃত ভাবা অসম্ভব মনে হচ্ছে হাসানের। চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল একটা দুর্দান্ত শক্তি।

বেশির ভাগ সময় ডেভিড কাটাতেন গতির মধ্যে। প্লেনে করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইণ্ডাস্ট্রির শাখা অফিসগুলোতে ঘুরতেন।

ডেভিড মেয়ার ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ। কে এখন তার উত্তরাধিকারী হবে? কেউ নেই। ডেভিড ভাবতেও পারেননি এতো তাড়াতাড়ি মরতে হবে তাকে।

হঠাৎ জ্বলে উঠলো ঘরের বাতিগুলো। হাসান চোখ ফেরালো দরজার দিকে।

'দুঃখিত, মি. হাসান, আমি ভাবিনি ভেতরে কেউ আছে।'

পারভিনের গলা। পারভিন হাফিজ সাদ্দামের সেক্রেটারী। হাসান ইস্তাম্বুল এলে পারভিন ওর কাজ করে। পারভিন স্থানীয় মেয়ে। বয়েস পঁচিশের কোঠায়। মুখটা সুন্দর। শরীর সাপিনীর মতো ধারালো। হাফিজ সাদ্দাম অনেকবার হাসানকে ইঙ্গিত দিয়েছে ইচ্ছে করলে ও পারভিনকে ব্যবহার করতে পারে। পারভিনের কাছ থেকেও এমন ইঙ্গিত পায় হাসান।

'আমার কয়েকটা চিঠি টাইপ করা বাকি ছিলো। আমি যাচ্ছি। অবশ্য তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারলে ধন্য হবো।'

বলতে বলতে হাসানের ডেস্কের দিকে এগোতে লাগলো পারভিন। ওর শরীরের ঝাঁজালো গন্ধে নিশ্বাস আটকে গেল হাসানের।

'পারভিন, সাদ্দাম কোথায়?'

হাসানের সামনে দাঁড়িয়ে স্কার্টের নিম্নাংশ ঘষতে ঘষতে পারভিন বললো, 'জানি না। ছুটি নিয়েছে। তোমাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'হ্যাঁ। সাদ্দামকে খুঁজে বের করো।'

'সত্যি বলছি, কোথায় আছে জানি না।'

'সামনের বার-টাতে যাও। নাহলে মারমারা নাইট ক্লাবে, ওখানে ওর মিসট্রেস নাচে, বাড়িতে বৌয়ের কাছেও থাকতে পারে।'

'মি. হাসান, ওকে হয়তো পাওয়া যাবে না।'

'পাবে কিনা জানি না, কিন্তু ও একঘন্টার মধ্যে এখানে না এলে ওর চাকরি থাকবে না।'

'আমি যাচ্ছি।'

'যাবার সময় বাতি নিবিয়ে দিও।'

ভাবার জন্যে অন্ধকারই ভালো। কী আশ্চর্য, এতো তাড়াতাড়ি সব ওলট পালট হতে পারে? এই তো, একদিন আগে দেখা হলো ডেভিডের সঙ্গে।

ভাবছে হাসান। স্মৃতির গভীরে ডুবে গেল ও।

এ সময় পাহাড়ে ওঠা অনেক নিরাপদ। মন্ট ব্লঙ্ক পাহাড়ে উঠতে গিয়েছিলেন ডেভিড মেয়ার। ইণ্ডাস্ট্রির পর তার একটাই নেশা ছিলো, পাহাড়ে ওঠা। ডেভিড মেয়ার একজন দুর্দান্ত পর্বতারোহী ছিলেন।

জুরিখ থেকে যাওয়ার সময় প্লেনে উঠে হাসতে হাসতে ডেভিড বলেছিলেন, হাসান, দেখে নিয়ো, এবার আমি মন্ট ব্লঙ্কের মাথায় মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের পতাকা গেড়ে আসবো।

ট্রেসির কাছ থেকে হল্যাণ্ডে ফেরার পর ইণ্ডাস্ট্রির কাজ শেষ হতে না হতেই জরুরী তলব এলো ডেভিড মেয়ারের কাছ থেকে। ট্রেসির সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মনটা উদাস উদাস লাগছিল হাসানের। না এলেই ভালো হতো। ডেভিড মেয়ারের অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করেছে এতদিন। ও জানতো, অভিমানী মেয়ে হবে ট্রেসি। নিজের জীবন থেকেই ওকে আন্দাজ করেছিল হাসান।

হাসান পৃথিবীতে এসেছে নিঃস্ব হয়ে। শেষ পর্যন্ত ওর বাবা হয়েছিলেন রিক্সাঅলা। এক ভূমিহীন কৃষকের ছেলে হাসান। অভাবের তাড়নায় শহরে এসেছিল ওদের পরিবার। তখন বেঁচে ছিল হাসান, ওর বড়বোন মরিয়ম, বাবা আর মা। ছোটবেলায় ও হারিয়েছে দু'ভাই আর এক বোনকে। প্রথম ভাই মরেছে ধনুষ্টংকারে, পরের জন ডিপথেরিয়ায়, বোনটা হামে।

ওরা ঢাকায় সংসার গুছিয়ে নেবার আগেই শুরু হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। হাসানের বয়েস তখন সাত। ঢাকা থেকে পালানোর সময় ওরা ধরা পড়লো খানসেনাদের হাতে। চারজন ছিলো দলে।

বাবাকে মেরে ফেললো হানাদাররা। হাসানকে মারতে যাবে এমন সময় ওর মা আর বোনকে দেখে ক্ষেপে উঠলো দস্যুগুলো। শুরু হলো উপর্যুপরি ধর্ষণ। মাকে আর বোনকে। ওরা ছিঁড়ে ফেললো মরিয়মের গলার লাল রিবন। মরিয়ম লাল ফিতা পরতে ভালবাসতো। হাসানের ভালো লাগতো বোনের গলার লাল ফিতা। বোন, সঙ্গী, বন্ধু বলতে একজনই ছিলো ওর। মরিয়ম।

দৌড়াতে আরম্ভ করলো হাসান। মা আর বোনের ওপর ওই বীভৎস অত্যাচার দেখে ওর পা দুটো ওর মনের বিরুদ্ধে দৌড়াচ্ছিল। ওর মন নিতে

চাচ্ছিল প্রতিশোধ।

এক হিন্দু পরিবার ভারতে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা হাসানের কথা শুনে ওকে কোলে টেনে নিলেন। হাসান জেদ ধরেছিল মা আর বোনের কাছে ফেরার জন্যে। তারা ওকে জোর করে ধরে রাখলেন। জীবনে আর মা এবং বোনের দেখা পায়নি হাসান।

কুচবিহারে আত্মীয় ছিলো ওই হিন্দু পরিবারটির। তাদের বাড়িতে উঠলেন তারা হাসান সহ। মা আর বোনের ইজ্জত হরণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিল হাসান। ওর বয়েসের কথা তুলে কেউ ওকে যুদ্ধে যেতে দিলেন না। এখানে শুরু হলো হাসানের নতুন জীবন। লেখাপড়া শেখা।

যুদ্ধের পর ওই পরিবারটির সঙ্গে ঢাকায় ফিরলো হাসান। ভর্তি হলো আগারগাঁ প্রাইমারী স্কুলে। সহজাত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল ও। বৃত্তি পেলো। ভর্তি হলো আগারগাঁ হাইস্কুলে। এস. এস. সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেলো। চার বিষয়ে লেটার। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, এবং দুই অঙ্কে।

অঙ্কর জ্ঞান হবার পর থেকে হাসানের বুকে জন্মালো উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ডাক্তার হতে হবে। দু'ভাই আর এক বোনের অকাল মৃত্যু কখনো ভুলতে পারেনি ও।

ঢাকা কলেজে ভর্তি হলো হাসান। শুধু স্কলারশীপের টাকায় তখন চলছিল না ওর। টিউশনি শুরু করলো। রেজাল্ট অতো ভালো হলো না। শুধু একটা প্রথম বিভাগ।

মেডিক্যালে ভর্তি হতে পারতো, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা তা হতে দিলো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো রসায়ন বিভাগে। অনার্স এবং এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণী পেলো। ডিপার্টমেন্ট থেকে অধ্যাপনার অফার এলেও হাসান যোগ দিলো একটা বিদেশী ওষুধ কোম্পানীতে জুনিয়র কেমিস্ট হিসেবে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি চায় ও। চাকরির পাশাপাশি রাতে পড়তে লাগলো বিজনেস অ্যাডমিনেস্ট্রেশন।

ইতিমধ্যে কয়েকটা নতুন ওষুধের ফর্মুলা দিলো হাসান। দ্রুত ব্যবসা বাড়তে লাগলো ওই ওষুধ কোম্পানীর। হাসানের মার্কেটিং-এর জ্ঞানও কাজে

লাগালো কোম্পানী।

তাড়াতাড়ি দুটো প্রমোশন পেলো হাসান। এরপর ওকে চীফ সেলস ম্যানেজার বানানো হলো। কিন্তু শুধু ভালো চাকরি আর অর্থ পেয়ে মন ভরলো না হাসানের। দুটো স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে ওর বুকে। বাংলাদেশে ও দেখতে চায় ডিপিটি, মিজেলস আর বিসিজি ভ্যাকসিন তৈরির ইণ্ডাষ্ট্রি। দু'ভাই আর বোনের অকালমৃত্যুর স্মৃতিতে বুক জখম হয়ে আছে ওর। আর বাংলাদেশের বনজ সম্পদ থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওষুধ বানানো যায় কিনা তার ওপর আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে চায় ও। কিন্তু ওর ওষুধ কোম্পানী এ প্রস্তাবে রাজি না। এতে মনে মনে বেশ ক্ষুব্ধ হাসান। সে সময় মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স বাংলাদেশে শাখা অফিস খোলার জন্যে প্রাথমিক জরিপ শুরু করেছে। ডেভিড মেয়ারের কানে এলো হাসানের কথা।

হাসানের সঙ্গে কথা বলে ডেভিড মেয়ারের কোনো সন্দেহ থাকলো না এই ছেলেকেই খুঁজছেন তিনি। মোটা বেতনের অফার পেলো হাসান। কিন্তু ও রাজি নয়। হাসান চায় ওর স্বপ্ন দুটোর বাস্তবায়ন। প্রথমে রাজি হননি ডেভিড মেয়ার। শেষে মত পাল্টান তিনি। তবে সময় চাইলেন। তিনিও শর্ত দিলেন, হাসানকে হেড অফিসে যোগ দিতে হবে।

ডেভিড মেয়ারের সহযোগিতায় নিজের সমস্ত প্রতিভা ঢেলে দিলো হাসান। খোলা হলো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সে অনেক নতুন বিভাগ, ল্যাবরেটরী; বাড়ানো হলো গবেষণার কর্মসূচী। তরতর করে ওপরে উঠতে লাগলো হাসান। শেষে ওকে ডিরেক্টর বানালেন ডেভিড মেয়ার।

কিন্তু ডেভিড মেয়ার ছিলেন একজন জহুরী। হাসানকে চিনতে তিনি ভুল করেননি। ওকে তিনি নিয়ে এসেছেন তার জামাই বানাবার জন্যে। হাসানের কাছে সে কথা লুকোননি ডেভিড। ওকে ডিরেক্টর বানাবার দিনই প্লেনে বসে বাশেভিস মেয়ারের উইল থেকে শুরু করে ট্রেসি পর্যন্ত সমস্ত কথাই বললেন ডেভিড মেয়ার।

'হাসান, শুধু তোমার হাতেই আমি ইণ্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিতে পারি। ট্রেসিকে

বিয়ে করো। আজ হোক কাল হোক মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া বাইরের কোনো লোকের কথা ভাবতে পারি না।'

'মি. মেয়ার, আপনার কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে আমার। পৃথিবীতে কেউ চায় না তার নিজ হাতে গড়া জিনিস অন্যের কাছে চলে যাক। কিন্তু আপনার আর কিছু করার নেই। তবে এতো হতাশ হবেন না। আমার মনে হয়, আপনি ট্রেসিকে অনেক খাটো করে দেখছেন। কে জানে, ওর ভেতরও এই ইণ্ডাস্ট্রি চালানোর প্রতিভা থাকতে পারে। যাক, সে কথা।

'মি. মেয়ার, আপনি জানেন আপনার কোনো অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কতো কঠিন। আমি এমন কোনো কাজ করবো না যাতে আপনি দুঃখ পান। কিন্তু আমার সমস্যাটা আপনি হয়তো আন্দাজ করতে পারেননি। আমি ট্রেসিকে বিয়ে করলে আপনার পরিবারের সবাই ভাববে আমি ওকে পাবার লোভেই এতোদিন বসে আছি। তাছাড়া, ট্রেসিরও নিজস্ব পছন্দ থাকতে পারে। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ট্রেসি আমাকে বিয়ে করতে চাইলে আমি ওকে ফেরাবো না।'

'ধন্যবাদ, হাসান।'

এরপর সবকিছুই ঠিকমত চলছিল। শুধু ট্রেসির সঙ্গে দেখা করতে যায়নি হাসান। দুটো কারণে। ও জানে, ট্রেসির কোনকিছুই অবহেলা করতে পারবে না ও। কিন্তু ট্রেসি ওকে অবহেলা করলে সেটা সহ্য করতে পারবে না হাসান।

এদিকে হঠাৎ গত এক বছর থেকে ইণ্ডাস্ট্রিতে শুরু হলো একটার পর একটা দুর্ঘটনা। রাতারাতি কমতে আরম্ভ করলো ইণ্ডাস্ট্রির নগদ আয়। মনে হচ্ছিল এতোদিনের বিশাল সাম্রাজ্য এক মহাসংকটের কবলে পড়েছে। এদিকে ডিরেক্টররা ওদের শেয়ার বিক্রির জন্যে চাপ দিতে লাগলো ডেভিড মেয়ারকে। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ালো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স।

পাগলের মতো ছটফট করতে লাগলেন ডেভিড মেয়ার। ডিরেক্টরদের কোনো কথাই শুনছেন না। মাঝে মাঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন

হাসানের দিকে।

হাসানও অনেক চেষ্টা করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না। কিন্তু ওর মন বললো, ঘটনা যাই ঘটুক ডিরেক্টরদের খেপানো ঠিক হবে না। তাই ও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। ডেভিড মেয়ারকে বললো, তাড়াতাড়ি দুর্ঘটনাগুলোর কারণ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করুন। ডিরেক্টরদের এভাবে চটানো ঠিক নয়।

ওর কথা পছন্দ হলো ডেভিড মেয়ারের। একদল ডিটেকটিভকে লাগালেন মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্যে। কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রাখলেন হাসানের কাছেও। হাসান শুধু জানলো, অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। কিন্তু কারা করছে সেটা ও জানে না। এর মধ্যে এলো ট্রেসির একুশতম জন্মদিন। ডেভিড মেয়ারের মনের অবস্থা চিন্তা করে এবার তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলো না হাসান। দেখা করতে গেল ট্রেসির সঙ্গে।

কিন্তু ট্রেসির সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই ভালো করতো হাসান। প্রেমের ফাঁদে পা দিতে হতো না ওকে। কিন্তু তখন ও জানতো না এর চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

হল্যাণ্ডে পৌঁছুতেই ডেভিড মেয়ারের টেলিফোন এলো, 'হাসান, তাড়াতাড়ি চলে এসো। শ্যামনিজ যাচ্ছি। মন্ট ব্লঙ্কে চড়বো। তোমার সাথে অনেক কথা আছে।'

শ্যামনিজে পৌঁছে হোটেলে উঠলো ওরা। রাতে, ডিনারের সময় হাসান দেখে কেমন গম্ভীর গম্ভীর দেখাচ্ছে ডেভিড মেয়ারের চেহারা। অথচ এর আগে পর্যন্ত বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন ডেভিড। প্রশ্ন না করে পারলো না হাসান।

'মি. মেয়ার, আপনার শরীর খারাপ ?'

'হাসান, আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে হয়তো না ডাকলেই ভালো করতাম। আমার এখন ভীষণ একা থাকতে ইচ্ছে করছে। মনে কিছু করো না, তুমি কোথাও বেড়াতে যাও।'

মনটা খচখচ করতে লাগলো হাসানের। কিছু একটা হয়েছে। কি যেন ওর কাছ থেকে গোপন করতে চাইছেন ডেভিড মেয়ার। ইস্তাম্বুলে চলে এলো ও।

পৃথিবীর অনেক রাজধানীতে থাকতে হয় হাসানকে, কিন্তু ইস্তাম্বুল ওর সবচেয়ে প্রিয়।...

আজকেই ওর এখান থেকে ঢাকা যাবার কথা। ভ্যাকসিন তৈরির ইণ্ডাস্ট্রি খোলার প্রাথমিক জরিপের কাজ শেষ হয়েছে। রিপোর্টটা দেখবে ও।

কিন্তু হোটেল থেকে বেরুনোর সময় টেলিফোন এলো শ্যামনিজ থেকে।

'ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট! বিশ্বাস করুন, মি. হাসান, আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ঘটনাটা এতো তাড়াতাড়ি ঘটে গেল; সাহায্য করার কোনো সুযোগই পাওয়া গেল না। মি. মেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন।'

ঢাকা আসা হলো না হাসানের। হাফিজ সাদ্দামের অফিসে ঢুকলো ও।

এখনো টেলিফোনের বাকি কথাগুলো বাজছে ওর কানে। '...হিমবাহের কবলে পড়েছিল অভিযাত্রীরা...পা পিছলে পড়ে যান মি. ডেভিড মেয়ার...তাঁর রশি ছিঁড়ে যায়...মি. মেয়ার পড়ে যান হিমবাহের ফাটলে...।'

আবার জ্বলে উঠলো ঘরের আলো। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হাফিজ সাদ্দাম। পিছনে পারভিন। এর মধ্যেই পোশাক পাল্টে ফেলেছে পারভিন। শরীরের অনেককিছুই এখন দেখা যাচ্ছে ওর। গলায় জড়িয়েছে লাল রিবন। যাওয়ার সময় বুঝেছে হাসানের মেজাজ ভালো নেই। হাসান লাল রিবন ভালবাসে। সে কথা হাসানই একদিন বলেছিল ওকে। ওর বড়বোন নাকি লাল রিবন পরতে ভালবাসতো।

রীতিমতো টলছে হাফিজ। মারমারা-য় চুর হয়ে এতক্ষণ নাচ দেখছিল ও।

'মি. হাসান,' ভুরভুর করে ওর মুখ থেকে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ, 'আমি দুঃখিত। আসলে আমি মনে করেছি আপনি অনেক আগেই ইস্তাম্বুল ছেড়ে ঢাকায় পাড়ি দিয়েছেন। এখন বলুন, এতো জরুরী তলব কেন?'

'হাফিজ বসো। যা বলছি মন দিয়ে শোনো। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের চারজন ডিরেক্টরকে চারটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। আমি খসড়া করে রেখেছি। পারভিন টাইপ করবে। পাঠানোর দায়িত্ব তোমার। টেলিগ্রামের বিষয় নিয়ে কেউ যেন কোনো কথাবার্তা না বলে, বললে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হবে।'

হাসান একটা চিরকুট দিলো হাফিজের হাতে। শরীর দুলিয়ে পারভিন এগিয়ে গেল টাইপ রাইটারের দিকে।

'হায় খোদা!' চিরকুটটা পড়ে চোখ গোল হয়ে গেছে হাফিজের। 'এই ভয়ঙ্কর ঘটনা কেমন করে ঘটলো।'

'এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মি. ডেভিড মেয়ার।'

'কিন্তু চারটা টেলিগ্রাম কেন? মিস মেয়ার···?'

'ওর কাছে আমি নিজেই যাচ্ছি। তুমি ওর ইউনিভার্সিটির সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে জানিয়ে দাও মিস মেয়ারের লেখাপড়া আজ থেকেই শেষ। তারা যেন কাগজপত্র তৈরি করে রাখে। আর কথা নয়, কাজ শুরু করো।'

দু'ঘন্টা পর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের একটা জেট উড়লো ভূমধ্যসাগরের আকাশে। ট্রেসিকে লং আইল্যাণ্ডের বাড়িতে নেয়ার জন্যে হাসান যাচ্ছে সুইজারল্যাণ্ড।

হস্টেলের রিসেপশন রুমে দুজন দুজনকে দেখে চমকে উঠলো। ট্রেসি আশা করেনি এতো তাড়াতাড়ি ওর দেখা হবে হাসানের সঙ্গে। হাসান আশা করেনি ট্রেসি গলায় পরে থাকবে ওর দেয়া লাল রিবন। ট্রেসির চেহারায় আগের সেই জড়তা নেই, একেবারে স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে। মেয়েটা সত্যি প্রকৃতির মতো সরল, কোনকিছু লুকোতে জানে না।

'ও লাল রিবন পরেছে কেন? ও কি আমার প্রেমে পড়েছে? সবকিছু এতো তাড়াতাড়ি ঘটছে কেন?' তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে হাসানের। ট্রেসি এখন ওর জীবনে সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত কবিতা ওর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব সরে থাকতে চায় হাসান, যদিও ওর মন সেদিন থেকে কাঁদছে মেয়েটির জন্যে। কিন্তু হাসান চায় না, ওকে কেউ লোভী ভাববার সুযোগ পায়।

অনেক কষ্টে দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখলো হাসান। হাতে সময় নেই। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেসিকে সব জানাতে হবে।

'মিস ট্রেসি, আমি দুঃখিত। আপনাকে এখনি লং আইল্যাণ্ডের বাড়িতে যেতে হবে।'

'কেন?'

'কথা আছে।'

'এখানে বলা যাবে না?'

'না। আপনি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন।'

'কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে না?'

'জানানো হয়েছে।'

প্লেনে ট্রেসির পিছনের সিটে বসতে যাচ্ছিল হাসান, কিন্তু তার আগেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো ওকে।

'মি. হাসান, আপনি আমার পাশে বসবেন না?'

'হ।' আনমনা হয়ে গেছে হাসান। পা দুটো কেমন অবশ অবশ লাগছে। মনে পড়ছে ডেভিড মেয়ারের সাথে ওর কথা। 'হাসান···ট্রেসিকে বিয়ে করো···মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থাকবে না···আমি তোমাকে ছাড়া বাইরের কোনো লোকের কথা ভাবতে পারি না।'··· 'মিঃ মেয়ার···আপনাকে কথা দিচ্ছি, ট্রেসি আমাকে বিয়ে করতে চাইলে আমি ওকে ফেরাবো না।'

'মি. হাসান, কি ভাবছেন? আপনার শরীর খারাপ?'

বাস্তবে ফিরে এলো হাসান। 'না···মানে···'

'ঠিক আছে, আপনি পিছনেই বসুন।'

কিছুই লুকোতে জানে না ট্রেসি। হাসান বুঝে ফেলেছে ওর অভিমান না, এখন ওর আবেগ নিয়ে খেলা করা অমানবিক। একটু পরেই ওকে শুনতে হবে চিরকালের জন্যে এতিম হয়ে গেছে ও।

ট্রেসির পাশে বসলো হাসান।

বোয়িং ৭০৭-৩২০ তখন ছুটে চলেছে কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে

চার

লং আইল্যাণ্ডের বাড়িতে ঢুকে হাসান বললো, 'ট্রেসি, আপনি আপনার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। আমি ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছি। তারপর কথা হবে।

ড্রইংরুমে বসে ভাবছে হাসান। কি বলবে ও ট্রেসিকে? কিভাবে কমাতে পারবে ওর মানসিক আঘাত? শব্দ, বাক্য বারবার মনে মনে সাজাতে লাগলো হাসান। কিন্তু ট্রেসি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই সব কথা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল ওর মাথা থেকে।

অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে ট্রেসিকে। মা-র সমস্ত সৌন্দর্য হরণ করেছে ওর মুখ। চোখ দুটো মধ্যরাতের মতো কালো। দীঘল আঁখিপল্লব। চকচক করছে মসৃণ কালো চুল। মোমের মতো নরম আর কোমল ত্বক, ফর্সা। সমৃদ্ধ শরীর।

গলাখোলা ক্রীম রঙের সিল্কের ব্লাউজ পরেছে ট্রেসি। চোখ ধাঁধানো আলো ছিটাচ্ছে সিল্কের লাল রিবন। কোমরে নিভাঁজ ধূসর ফ্লানেলের স্কার্ট।

হাসছে ট্রেসি। প্রভাতের মতো সজীব দেখাচ্ছে ওর মুখ। চেহারার কোথাও নেই দুশ্চিন্তার বিন্দুমাত্র ছাপ। কেমন করে ওর এখনকার তাজা মনটাকে রক্তাক্ত করবে হাসান? কথা ফুটছে না ওর মুখে। চোখও ফেরাতে পারছে না ট্রেসির লাবণ্য থেকে। হায়, যদি অনন্তকাল ধরে থমকে থাকতো এই মুহূর্ত!

কিন্তু হাসানকে উদ্ধার করলো ট্রেসি নিজেই। ওকে নির্বাক দেখে ট্রেসি জানতে চাইলো, 'হাসান, বাবাকে দেখছি না। আপনি জানেন উনি কোথায়?'

'ট্রেসি···মি. মেয়ার একটা দুর্ঘটনায়···।' হাসান দেখতে পাচ্ছে, ট্রেসির মুখ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে রক্ত। দেখতে দেখতে সাদা কাগজে রূপান্তরিত হলো একটু আগের হাসিখুশি মুখটা। কিন্তু আশ্চর্য, অসীম ধৈর্য নিয়ে ও অপেক্ষা করছে হাসানের বাকি কথা শোনার জন্যে। '··· ডেভিড মেয়ার মারা গেছেন।'

দাঁড়িয়ে আছে ট্রেসি। মনে হচ্ছে বরফে জমে গেছে ওর শরীর।

অবশেষে কথা বললো ও। অনেক কষ্টে হাসান বুঝলো, ও বলেছে, 'কি...কি হয়েছিল?'

'আমরা এখনো বিস্তারিত খবর পাইনি। মন্ট ব্লঙ্কে উঠছিলেন মি. মেয়ার। হঠাৎ তার রশি ছিঁড়ে যায়। হিমবাহের ফাটলে পড়ে যান তিনি।'

'বাবার লাশ···?' চোখ বন্ধ করলো ট্রেসি। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। আবার চোখ খুললো ও।

'না। পাওয়া যায়নি। পাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।'

পাথর হয়ে গেল ট্রেসি। মুখ ফ্যাকাশে। আঁতকে উঠলো হাসান, 'মিস ট্রেসি, আপনি ঠিক আছেন তো?'

হাসছে ট্রেসি।

হাসতে হাসতে বললো, 'হ্যাঁ। অবশ্যই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মি. হাসান। আপনি কিছু খাবেন? চা? কফি?'

ঘাবড়ে গেছে হাসান। স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলছে না ট্রেসি। অথচ এটাই স্বাভাবিক। কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই এই মানসিক আঘাত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এক শোকের সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে ট্রেসি। এখনকার মুহূর্তগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এখন ও যদি অনুভব করে ওর দুঃখের কোনো সঙ্গী নেই, তাহলে মারাত্মক হতে পারে তার ফলাফল। হাসান অনুভব করছে এ মুহূর্তে ট্রেসির মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ওর একার। সেখানে শর্ত নেই।

উঠে, মন্থর পায়ে ট্রেসির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হাসান, ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকলো, 'ট্রেসি।'

তাকালো ট্রেসি। চোখগুলো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। হাসছে।

'ট্রেসি…'

'মি. হাসান, ডেভিড মেয়ার একজন দুর্দান্ত পর্বতারোহী ছিলেন, তাই না? তার ঘরে অনেক ট্রফি আছে। তিনি সবসময় প্রতিযোগিতায় জিততেন, তাই না? বাবা তো আগেও মন্ট ব্লঙ্কে উঠেছেন। আপনি নিজেও তো অনেকবার তার সঙ্গে পর্বতারোহণে গেছেন…'

'হ্যাঁ, ট্রেসি আপনার কথা সত্যি। কিন্তু আপনি কথা বলুন। আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে।'

হাসান চাইছে একটানা কথা বলে যাক ট্রেসি। দুঃখের অনুভূতিগুলো অবশ হয়ে আসুক ওর। নিজের নিঃসঙ্গতার চারপাশে গড়ে তুলুক কথার পাহাড়।

রাত বারোটা বাজলো। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ট্রেসি। এখন ওর ঘুমানো দরকার।

হাসান ডাকলো, 'ট্রেসি, ডাক্তার নিয়ে আসি। হয়তো কোনো ওষুধ …'

'না না, আমার কিছু হয়নি। আমি এখন সুস্থ বোধ করছি। কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে চাই। আপনি কিছু মনে করবেন না তো, মি. হাসান।'

'আপনি চাইলে আমি এখানে থাকতে পারি।'

'না, না, তার দরকার হবে না। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'দরকার হলেই আমাকে টেলিফোন করবেন। এতোটুকু ইতস্তত করবেন না। আমি সবসময় থাকবো।'

দরজা পর্যন্ত হাসানের সঙ্গে এলো ট্রেসি। হাসান গাড়িতে ওঠার সময় পিছন থেকে ওকে ডাকলো ট্রেসি, 'হাসান।'

ফিরে তাকালো হাসান।

'আমাকে এতক্ষণ সঙ্গ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে ট্রেসি। হাসান গেছে অনেকক্ষণ হলো। সবখানে ঝুল জমেছে। অনেকদিন হলো এ ঘরটায় শোয়নি ও।

হঠাৎ ব্যথায় চিনচিন করে উঠলো বুক। হ্যাঁ, এই ব্যথার জন্যেই এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছে ট্রেসি। সেজন্যেই হাসানের ডাক্তার দেখানোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। ওষুধ খেয়ে ব্যথা কমাতে সায় দেয়নি ওর মন। এই ব্যথাটা বাবার পাওনা হয়েছে ওর কাছ থেকে। সেটা মেটাতে এতোটুকু কার্পণ্য করবে না ও। যতোই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন সে ব্যথা, ট্রেসি আজ তা সইতে পারবে, কেননা ও তো ডেভিড মেয়ারের একমাত্র সন্তান।...

এই তো কয়েকদিন হলো ও জেনেছে, বাবা ওকে ভালবাসতেন। তখন থেকে জীবনের ধারণাটাই পাল্টে গেছে ওর। নিজেকে আর অবাঞ্ছিত মনে হয় না ট্রেসির। এ কয়েকদিন বাবাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে ও। ভেবেছে, লেখাপড়া শেষ হলেই বাবার পাশে দাঁড়াবে ও। আর কিছু না হোক কমপক্ষে মা--র অভাবটা মুছে দেবে বাবার জীবন থেকে। বাবা না চাইলেও জোর করে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সব সময়। ব্যস্ত ডেভিড মেয়ার আর ওকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, কেননা তাঁর মেয়ে জেনে গেছে তার বাবার মনের গোপন খবর।...কিন্তু ডেভিড মেয়ার সত্যি ওকে ফাঁকি দিলো...

বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে ট্রেসি দেখছে, আঁধার কেটে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে উঠছে দিনের সূর্য। জন্মেই এক জোড়া দুর্ভাগ্য উপহার দিয়েছিল ও মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. ডেভিড মেয়ারকে। আর আজ, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সাম্রাজ্য থেকে চিরকালের জন্যে বিদায় নিয়েছেন তিনি। যাওয়ার সময় কাউকে বলে যেতে পারেননি তাঁর প্রিয় ইণ্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ নিয়ে কি ভাবছিলেন তিনি।...

টেলিফোন বেজে উঠলো। রিসিভার ধরার জন্যে ছুটে গেল ট্রেসি। ঘোরের

মধ্যে ওর মনে হয়েছে বাবা ডাকছেন। কিন্তু রিসিভারে হাত দিতেই মনে পড়লো, বাবা নেই।

'হ্যালো। ট্রেসি?'

'হ্যাঁ। হাসান?'

'হ্যাঁ। রাতে ঘুম হয়েছে? ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

'শুনুন, আমি মন্ট ব্লঙ্কে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হতে পারে। চিন্তা করবেন না।'

'মন্ট ব্লঙ্ক! আমিও যাবো।'

'না। না। আপনি ক্লান্ত।'

'না। আমি যাবো।'

জেনেভা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্যামনিজ। পাহাড়ী শহর। সমুদ্র থেকে তিন হাজার চারশত ফুট ওপরে। এখানেই মন্ট ব্লঙ্ক পর্বতমালা।

শহরের কেন্দ্রস্থলে পুলিস স্টেশন। ছোট্ট একটা বিল্ডিং।

ভেতরে ঢুকে ওর নিজের এবং ট্রেসির পরিচয় দিলো হাসান। দুঃখ প্রকাশ করলেন ফরাসী সার্জেন্ট। 'দুঃখিত, মিস মেয়ার। মি. মেয়ারের মতো একজন তুখোড় পর্বতারোহীর জীবনে এমন দুর্ঘটনা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। আমরা মি. মেয়ারের মালপত্র তাঁর হেড অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন বলুন, আপনাদের কিভাবে সাহায্য করবো।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বললো হাসান, 'এখানে কে মি. মেয়ারের দুর্ঘটনার পুরো খবর দিতে পারবে? আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'এটা পর্বতারোহী উদ্ধারকারী সংস্থার কাজ। সংস্থার নাম শ্যামনিয়া সেকুর। মন্ট ব্লঙ্কের পাদদেশে। টেলিফোন ৫৩১৬৮৯। আমি লিখে দিচ্ছি।'

শ্যামনিয়া সেকুরের ইনচার্জ একজন যুবক। চেহারা, পোশাক খেলোয়াড়দের মতো। একটা ডেস্কের পিছনে বসেছিল ও। হাসান এবং ট্রেসিকে ভেতরে ঢুকতে

দেখে কোনো উৎসাহ জাগলো না ওর মধ্যে। এক নজর দেখেই বুঝেছে ওই যুবক-যুবতী পর্বতারোহী নয়।

'বলুন, কি চাই?' কোনো সৌজন্য না দেখিয়ে জানতে চাইলো ইনচার্জ।

'আমি হাসান জহির। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের চীফ এক্সিকিউটিভ। উনি মিস মেয়ার, মি. মেয়ারের একমাত্র কন্যা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ইনচার্জ যুবক। 'বসুন, বসুন,' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ও, 'মি. মেয়ার আমার খুবই প্রিয় আরোহী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার জীবনেই ঘটলো এমন দুর্ঘটনা।'

'আপনি ঘটনাটা দেখেছেন?'

'না। মি. মেয়ারের দলের বিপদ সংকেত পেয়ে আমি উদ্ধারকারী দল নিয়ে সাথে সাথে সেখানে পৌঁছি। কিন্তু তখন ঘটনা ঘটে গেছে। মি. মেয়ার হারিয়ে গেছেন ফাটলে। কখনোই আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কি হয়েছিল?'

'দলে চারজন ছিলো। সবার আগে ছিলেন মি. মেয়ার। তাঁর সবচেয়ে কাছে ছিলো গাইড। পা পিছলে পড়ে যান মি. মেয়ার।'

'হার্নেস' পরে ছিলেন না তিনি?'

'হ্যাঁ, ছিলেন। কিন্তু দড়ি ছিঁড়ে যায়।'

'এমন ঘটনা কি হরহামেশাই ঘটে?'

'জীবনে একবার। অভিজ্ঞ আরোহীরা তাদের যন্ত্রপাতি ভালমতো পরীক্ষা না করে কখনোই পা বাড়ান না। কিন্তু দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।'

'দলের আর সবাই বেঁচে আছে?'

'না। বলতে ভুলে গেছি। শুধু গাইড বেঁচে আছে।'

'আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'মি. মেয়ার যাকে নিয়ে নিয়মিত পর্বতারোহণ করতেন সে ভদ্রলোক সেদিন ছিলেন না।'

'কেন?'

'ঠিক জানি না। শুনেছি, তিনি অসুস্থ। তার জায়গায় অন্য গাইড গেছে।'

'আপনি তাকে চেনেন?'

'না। তবে তার ঠিকানা আমাদের অফিসে আছে।'

'অনুগ্রহ করে জানাবেন?'

'এক মিনিট, প্লীজ। আমি নিয়ে আসছি।'

পাশের ঘরে ঢুকলো ইনচার্জ। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এলো হাতে একটা চিরকুট নিয়ে। ঠিকানাটা পড়লো হাসান। হ্যানস বার্গমেন; গ্রাম, লেসগেটস।

'গ্রামটা কোথায়?' জানতে চাইলো হাসান।

'এখানে নয়,' মানচিত্র দেখে বললো ইনচার্জ, 'এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমার হয়তো বলা ঠিক হবে না, তবু বলছি। আমি আমার প্রিয় আরোহী হারিয়েছি। দুঃখিত, মিস মেয়ার। আমার করার কিছুই ছিলো না। যা হোক। ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ,' বললো ট্রেসি। যুবকের কথা ওর মন স্পর্শ করেছে।

একটা ভক্সওয়াগন ভাড়া করে লেসগেটস গ্রামের দিকে রওনা হলো হাসান আর ট্রেসি। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে সেখানে পৌঁছুতে ওদের সময় লাগলো প্রায় তিন ঘন্টা।

লেসগেটসকে দেখে গ্রামও মনে হচ্ছে না। রাস্তায় লোকজন নেই। বাড়িগুলো ছোটো ছোটো কুটিরের মতো। হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র দোকান। বড় জেনারেল স্টোর একটাই। তার সামনে পেট্রোল পাম্প। এক কোণে, ফাঁকা জায়গায়, একটা উন্মুক্ত মদের দোকান। জনা দশেক লোক মদ খেতে খেতে আগুন পোয়াচ্ছে। মানুষ দেখে মদের দোকানের দিকে পা বাড়ালো হাসান আর ট্রেসি।

ওদের ভেতরে ঢুকতে দেখে থেমে গেল মদের দোকানের খোশগল্প। সবাই অবাক চোখে দেখছে অপরিচিত যুবক যুবতীকে।

'আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বললো হাসান, 'আমরা হ্যানস বার্গমেন নামের এক লোককে খুঁজছি।'

'কে?'

'হ্যানস বার্গমেন। গাইড। এই গ্রামের ছেলে।'

আসরের সবচেয়ে বুড়ো লোকটি আগুনের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বললো, 'মি., আপনি ভুল করছেন। ও নামের এই গ্রামে কেউ নেই।'

'কিন্তু শ্যামনিয়া সেকুর থেকে আমাদের তাই বলা হয়েছে।'

'আপনাদের সঙ্গে মস্করা করেছে হয়তো। আমার চোদ্দপুরুষ এই গ্রামে জন্মেছে। আমি ওই নাম জীবনে শুনিনি।'

'হাসান!' চিৎকার করে উঠলো ট্রেসি।

হাসান দেখে টলতে টলতে আগুনের ওপর পড়ে যাচ্ছে ট্রেসি। দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো ও। থরথর করে কাঁপছে ট্রেসি। ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো হাসান।

'হাসান, ওরা আমার বাবাকে খুন করেছে,' হাসানের কাঁধে মাথা রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো ট্রেসি।

'ট্রেসি, শান্ত হোন, যা ভাবছেন তা না-ও হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। চলুন থানায় যাই।'

'মি. হাসান, আপনার কথা বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে,' হাসানের কথা শুনে মন্তব্য করলো ফরাসী সার্জেন্ট।

'না, সার্জেন্ট, এটা দুর্ঘটনা নয়,' বললো ট্রেসি।

'সার্জেন্ট, কিছু মনে করবেন না। বুঝতেই পারছেন মিস ট্রেসি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।'

'না, না, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করবো। শিগগির শুরু করছি তদন্ত।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট। আপনার কোনো সাহায্য দরকার হলে আমাদের জানাবেন। একটা কথা, আপনার রিপোর্ট সরাসরি মিস ট্রেসিকে পাঠাবেন, আর

কাউকে নয়।'

'ঠিক আছে।'

ফেরার পথে হাসান ট্রেসিকে বললো, 'ট্রেসি, আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা ভেঙে পড়ার সময় নয়। আপনাকে শক্ত হতে হবে।'

'হাসান, ডেভিড মেয়ারের কি কোনো শত্রু ছিলো?'

'এসব মানুষের শত্রুর প্রয়োজন হয় না। এদের অর্থ, ক্ষমতাই এদের শত্রু।'

'আমি সত্যি না জানা পর্যন্ত অস্থির থাকবো।'

'খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভেঙে পড়বেন না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই পর্তুগাল যাচ্ছি।'

'কেন?'

'এমন কিছু না। ইণ্ডাস্ট্রির কাজে। কাল সকালে আপনার কাছে অ্যাটর্নি যাবেন। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।'

পরের দিন সকালে ডেভিড মেয়ারের অ্যাটর্নি ট্রেসিকে বললেন, 'আমি মি. মেয়ারের উইল সাথে করে নিয়ে এসেছি। মিস মেয়ার। এসব কথা এখন আলাপ করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমরা কেউই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। উইল অনুযায়ী আপনি মি. মেয়ারের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কন্ট্রোলিং শেয়ার এখন আপনার হাতে। এখন আপনার ইচ্ছে, এটা নিয়ে আপনি কি করবেন, কিংবা কাকে দেবেন। মিস মেয়ার, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ডিরেক্টর বোর্ডে আপনিই প্রথম মহিলা। আপনি আপনার বাবার জায়গা নিচ্ছেন। এগারো তারিখে ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং। আপনি সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ।'

দশ তারিখে, পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের এক অ্যাপার্টমেন্টে পুলিস এক যুবতীর লাশ উদ্ধার করলো। লাশ সম্পূর্ণ নগ্ন। শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে

ওকে। সারা অঙ্গে যৌনমিলনের চিহ্ন। গলায় লাল রিবনের ফাঁস।

পাঁচ

জুরিখ। শুক্রবার। ১১ই সেপ্টেম্বর। দুপুর।

জুরিখের পশ্চিমে ষাট একর এলাকা জুড়ে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের হেড অফিস। প্রশাসনিক ভবন বারোতলা। আধুনিক বিল্ডিং বলতে যা বোঝায় প্রশাসনিক ভবন তাই। পুরো বিল্ডিং কাচ দিয়ে তৈরি। প্রশাসনিক ভবনকে ঘিরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দালান। প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, পরিকল্পনা, উৎপাদন আর ল্যাবরেটরি বিষয়ক উইংগুলো আছে ওইসব দালানে।

প্রশাসনিক ভবন আধুনিক হলে রিসেপশন লবিকে বলতে হবে আধুনিকতম। সাদা আর সবুজ রঙ দিয়ে সাজানো। আসবাবপত্রগুলো ডেনিশ।

কাচের ডেস্কের পিছনে বসে আছে রিসেপশনিস্ট রমণী। ও যেসব সৌভাগ্যবান মানুষকে ভেতরে যাবার অনুমতি দিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে একজন করে গাইড।

লবির ডানদিকে একসারি লিফট। তার মধ্যে দুটো ব্যক্তিগত। একটা ডিরেক্টররা ব্যবহার করে; অন্যটা এক্সপ্রেস, শুধু ম্যানেজিং ডিরক্টরের জন্যে।

আজ সকাল থেকে ডিরেক্টরদের ব্যক্তিগত লিফটটা পাঁচবার ওঠানামা

করেছে। ইওরোপের চারটি রাজধানী থেকে ওদের কেউ এসেছে প্লেনে কেউ বা হেলিকপ্টারে। এখন ওরা ট্রেসির জন্যে অপেক্ষা করছে ওক কাঠের প্যানেলে ঘেরা মস্ত বড় বোর্ডরুমে। লণ্ডন থেকে এসেছে স্যার রিচার্ড, বার্লিন থেকে বাওয়ার, প্যারিস থেকে ভাদিম, রোম থেকে কার্লো। আর আছে শেয়ারবিহীন ডিরেক্টর হাসান জহির।

ডিরেক্টরদের টেবিলের পাশে পরিবেশন করা হয়েছে রিফ্রেশমেন্টস, ড্রিংকস। কিন্তু কেউ ওগুলো ছুঁয়েও দেখছে না। ভেতরে ভেতরে সবাই উত্তেজিত, নার্ভাস; নিজের নিজের ব্যক্তিগত চিন্তায় মগ্ন।

ঘরে ঢুকে চল্লিশোর্ধ্ব মধ্যবয়সী মহিলা হেলেন পুনার ঘোষণা করলো, 'মিস মেয়ারের গাড়ি এসে গেছে।' এরপর তার অভিজ্ঞ চোখ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো বোর্ডরুমের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, অর্থাৎ কলম, নোটপ্যাড, পানি, সিগার, সিগারেট, ছাইদানি, দেশলাই ঠিকঠাক জায়গায় আছে কিনা।

হেলেন পুনার ডেভিড মেয়ারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। পনেরো বছর ধরে কাজ করছে হেড অফিসে। ভালো করে দেখে নিয়ে মাথা দোলালো পুনার। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রশাসনিক ভবনের সামনে দাঁড়ালো ট্রেসির গাড়ি। শোফার দরজা খুলে দিতেই বেরিয়ে এলো ও। পরনে কালো স্যুট, সাদা ব্লাউজ। গলায় লাল রিবন। মুখে কোনো প্রসাধনী নেই। বয়স তাতে আরো কম দেখাচ্ছে ওর। কিন্তু চেহারা বিমর্ষ, যেন জীবনের সব দায়িত্ব থেকে অবসর নিতে চায়।

লবিতে প্রচার মাধ্যমের লোকজন অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ভেতরে ঢোকার আগেই সবাই ছেঁকে ধরলো ট্রেসিকে। সক্রিয় হয়ে উঠলো টেলিভিশন, বেতার এবং খবরের কাগজের সাংবাদিকরা; সে সঙ্গে ওদের ক্যামেরা, মাইক্রোফন।

'মিস মেয়ার, আমি লা ইওরোপ থেকে এসেছি···আপনি কি একটা বিবৃতি দেবেন···আপনার বাবার মৃত্যুর পর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের দায়িত্ব কে নিচ্ছেন?···'

'মিস মেয়ার, অনুগ্রহ করে একটু এদিকে তাকান না···আমাদের পাঠক

আপনার একটা হাসি উপহার চায়…'

'মিস মেয়ার, আমি অ্যাসোসিয়েট প্রেস থেকে বলছি…আপনার বাবা কোনো উইল রেখে গেছেন?…'

'মিস মেয়ার, নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ আপনার কথা শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে…আপনার বাবা একজন নামকরা পর্বতারোহী ছিলেন…তার দুর্ঘটনার কারণ কি জানা গেছে?…'

'মিস মেয়ার, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স-এর অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর একটা প্রতিবেদন বের করতে চায়…আপনি এ সম্পর্কে কিছু বলবেন?…'

ট্রেসিকে আড়াল করে রেখেছে পাঁচজন সিকিউরিটি গার্ড। ওদের সাহায্যে সাংবাদিকদের সমুদ্র পেরিয়ে যুদ্ধ করতে করতে সামনে এগোতে লাগলো ও।

'মিস মেয়ার, আর একটা ছবি…'

এক্সপ্রেস লিফটে ঢুকলো ট্রেসি। সাংবাদিকদেরকে হতাশ করে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বুক ভরে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলো ও। যাক্, বাঁচা গেল। এক মুহূর্তের জন্যেও কি ওকে কেউ শান্তিতে থাকতে দেবে না?…বাবা! তুমি কেন এতো তাড়াতাড়ি মারা গেলে?…

আড়াই মিনিট পর ট্রেসি ঢুকলো বোর্ডরুমে।

সবার আগে ওকে স্বাগত জানালো রিচার্ড। গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'ট্রেসি, জানি না কিভাবে আমার দুঃখ প্রকাশ করবো; এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হয় না। তোমার ভাবী এবং আমি তোমাকে কয়েকবার টেলিফোন করেছি, কিন্তু…'

'ধন্যবাদ, রিচার্ড। আমি শুনেছি। ডরিস কেমন আছে?'

টেবিল ছেড়ে উঠে এসে ওর কপালে চুমু খেয়ে কার্লো বললো, 'সিনোরিনা, কিছু বলে তোমার দুঃখ বাড়াতে চাই না। তুমি ভালো আছো তো? সোফিয়া তোমার জন্যে ভীষণ চিন্তিত।'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, কার্লো। সোফিয়াকে নিয়ে এলে না কেন?'

ভাদিম ওর কাছে আসার আগেই ট্রেসি বললো, 'হ্যালো, ভাদিম।'

'ট্রেসি, আমি এবং লিজি কি অবস্থায় আছি বোঝাতে পারবো না। আমাদের কিছু করার থাকলে বলো?'

'না। ধন্যবাদ।'

কিন্তু বাওয়ারকে এড়াতে পারলো না ট্রেসি। গটগট করে হেঁটে এসে ও বললো, 'ট্রেসি, স্টেফি তোমার এখানে আসার জন্যে আমার মাথা খেয়েছে। আমি শুধু তোমার ঝামেলার কথা চিন্তা করে...'

'ধন্যবাদ, বাওয়ার।'

সব মিথ্যে। কৃত্রিম। লোক দেখানো সহানুভূতি। অথচ এরাই ওর ভাই, দুলাভাই! বাশেভিসের স্বপ্নে দেখা মেয়ার পরিবার। ওদের কথার ছাপ চেহারায় নেই। কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। সে ফাঁকটা ধরতে পারছে না ট্রেসি। তাই ঘরে ঢোকার পর থেকেই একটা অস্বস্তি কুরেকুরে খাচ্ছে ওকে। এমনিতেই এখানে আসতে চায়নি ওর মন। ও জানতো, এখানে এলে শুধু বাবার কথা মনে পড়বে। বাবার মৃত্যু রহস্য না জানা পর্যন্ত সবকিছু বিস্বাদ হয়ে আছে। তার ওপর ভাই আর দুলাভাইদের এই লোক দেখানো সহানুভূতি! গোটা পরিবেশের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়েছে ট্রেসি। মন চাইছে, এখনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে। একা, সম্পূর্ণ একা থাকতে চায় ও।

ট্রেসি ঢোকার পর উঠে দাঁড়িয়েছে হাসানও। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়েনি। তখন থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ট্রেসির মুখ। লক্ষ্য করছে ওর ভাবের পরিবর্তন।

দেখতে দেখতে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো হাসান। এই ঝুটঝামেলা তাড়াতাড়ি বন্ধ না হলে ভেঙে পড়বে ট্রেসি। এখনি কিছু করা দরকার।

চক্ষুলজ্জার কথা ভুলে গিয়ে ডিরেক্টরদেরকে সরিয়ে দিয়ে ট্রেসির সামনে দাঁড়িয়ে হাসান ডাকলো, 'হ্যালো, ট্রেসি।'

'হ্যালো, হাসান।' মন্ট ব্লঙ্ক থেকে ফেরার পর হাসানের সঙ্গে দেখা হয়নি ট্রেসির। এই তো কয়েকদিন মাত্র, তিনদিনও হবে না, অথচ মনে হচ্ছে কতো

বছর কেটে গেছে। আরো আশ্চর্য! ওর চেহারা কেমন উদাসীন আর নিষ্ঠুর। এ কোন হাসানকে দেখছে ট্রেসি! এই সুদর্শন পুরুষই কি ওর একুশতম জন্মদিনে হঠাৎ করে পাওয়া ওর মনের নায়ক!

হাসান যেন ট্রেসির ভাবনাগুলো ঠিকঠিক পড়তে পেরেছে, তাই ওকে সাহায্য করার জন্যে ডিরেক্টরদের উদ্দেশে বললো, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমরা এখন সবাই একত্রিত হয়েছি; অতএব সভার কাজ এখনি শুরু করা যেতে পারে।' তারপর হাসতে হাসতে শেষ করলো, 'আশা করি, সভা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বেশি সময় নেবে না।'

হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো ট্রেসির মন। সেটা পুষিয়ে দেবার জন্যে ও একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিলো হাসানকে। সত্যি, এখান থেকে মুক্তি চাইছে ও, এবং সেটা যতো তাড়াতাড়ি পায় ততোই মঙ্গল। ট্রেসি জানে না, সভার আলোচ্য বিষয় কি, কেমন করে সভাপতিত্ব করতে হয়; অথচ হাস্যকর হলেও সত্যি, ও সভার সভাপতি। একমাত্র ভরসা হাসান। এবং সৌভাগ্য, ও উপস্থিত আছে। হাসান থাকা মানেই ডেভিড মেয়ার থাকা। সে কারণে ট্রেসির কোনো চিন্তা হচ্ছে না। ও শুধু চাইছে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক এই সভা। বাবার মৃত্যু রহস্য না জানা পর্যন্ত ইণ্ডাস্ট্রির কাজে মন বসাতে পারবে না ও।

ডিরেক্টররা নিজের নিজের আসনে বসলো। হাসান ট্রেসিকে নিয়ে এলো টেবিলের মাথায়; সভাপতির চেয়ারটা টেনে বের করে ওকে বসতে সাহায্য করলো, তারপর ফিরে গেল নিজের আসনে।

'এটা আমার বাবার চেয়ার।' চেয়ারে বসেই ভাবলো ট্রেসি। 'এখানেই বসতেন তিনি। সভার সভাপতিত্ব করতেন।' সেই বাবার চেয়ারে আজ বসেছে ও। তার মানে বাবাকে জয় করে ফেলেছে ও। আর বাবাকে জয় করার সাধনাই ট্রেসি শুরু করেছিল ওর বোঝার বয়স হবার পর থেকে। সেই জয় আজ ওর হাতের মুঠোয়। অথচ বাবার জীবিতকালে তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি ও, জয় করা তো দূরে থাক; শুধু হাসানের মুখে শুনেছে বাবা ওকে ভীষণ ভালবাসতেন। কিন্তু বাবা মরার সঙ্গে সঙ্গে না চাইতেই কতো সহজে সবকিছু

চলে এসেছে ওর দখলে। কী অদ্ভুত পৃথিবী! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ট্রেসির বুক থেকে।

কথা শুরু করলো ভাদিম, 'যেহেতু আমাদের আর নতুন কিছু বলার নেই…,' কিন্তু কথা শেষ না করে ও তাকালো রিচার্ডের দিকে, 'রিচার্ড, তুমিই শুরু করো।'

হাসান নয়, মেয়ার পরিবারের অন্য তিনজন ডিরেক্টরের দিকে তাকালো রিচার্ড। ওরা সবাই ভাদিমের উক্তির সমর্থনে মাথা দোলালো। রিচার্ড বললো, 'ঠিক আছে।'

হাত বাড়িয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপলো রিচার্ড। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো পুনার। হাতে নোটবই। কলম। সভার কার্যবিবরণী লিখতে হবে ওকে।

'ট্রেসি, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের বোর্ড মিটিং-এর লৌকিকতাগুলোকে বাদ দিতে পারি,' ভাষণ শুরু করলো রিচার্ড, 'ডেভিড মেয়ারের মৃত্যু আমাদের সবার জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি; কিন্তু দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে তাঁকে নিয়ে ভাববার সময় আমাদের হাতে নেই, কেননা সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে জনসাধারণের কাছে আমাদের মানসম্মান বলতে কিছু নেই।'

'প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদেরকে খুঁচিয়ে মারছে,' আক্ষেপ ঝরে পড়লো ভাদিমের কথায়।

'কেন?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জানতে চাইলো ট্রেসি।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলো কার্লো আর বাওয়ার, কিন্তু তার আগেই হাসান শোনালো ওর মন্তব্য, 'মিস ট্রেসি, গত বছর থেকে হঠাৎ করে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রি অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, দেশে দেশে আমাদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, বেশ কিছু ব্যাংক তাদের ঋণ ফেরত দেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করেছে আমাদের ওপর। আসল কথা হচ্ছে, এগুলো কোনটাই আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির জন্যে গৌরবের বিষয় নয়। একটা ওষুধ কোম্পানী ভালো ওষুধ তৈরি

করে বলেই মানুষ তাকে বিশ্বাস করে। কোনো কারণে সে বিশ্বাস নষ্ট হলে আমরা আমাদের খদ্দের হারাবো।'

হাসানের মন্তব্যের প্রতিবাদে গভীর আস্থার সাথে কার্লো জানালো, 'ট্রেসি, কিন্তু তাই বলে ব্যাপার এমন নয় যে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। আমাদের এখন যা করণীয় তা হচ্ছে কোম্পানীকে খুব তাড়াতাড়ি নতুন করে ঢেলে সাজানো।'

'কেমন করে?' জানতে চাইলো ট্রেসি। কারো কথাই খুব একটা মাথায় ঢুকছে না ওর। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স সম্পর্কে এমন বাজে কথা আগে কখনো শোনেনি ও।

'আমাদের নিজ নিজ শেয়ার বিক্রি করে দিয়ে,' উত্তর দিলো বাওয়ার।

রিচার্ডের দিকে চোখ ফেরালো ট্রেসি। 'তুমি কি এ'কথাই বলতে চাইছো?'

'হ্যাঁ, ট্রেসি, আমরা সবাই এ'ব্যাপারে একমত।'

চেয়ারে হেলান দিলো ট্রেসি। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মেয়ার অ্যাণ্ড সং এখন আর লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রি নয়! দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে মামলা চলছে! ব্যাংকগুলো তাদের ঋণ ফেরত চাইছে! মানুষ এর তৈরি ওষুধের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে! এগুলো কি শুনছে ও? এমন কথা আজকের আগে কেউ তো ওকে বলেনি। বলেনি কেন? একদিকে বাবার রহস্যময় মৃত্যু, অন্যদিকে ইণ্ডাস্ট্রির অনিশ্চিত ভবিষ্যত; এসব কিসের সঙ্কেত? ও আর হাসান ছাড়া ডেভিট মেয়ারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্যের কথা কেউ জানে না। হয়তো ওদের জানার আগ্রহও নেই। ওরা ওদের শেয়ার বিক্রি করতে চায়। কেন? শেয়ার বিক্রি করলে কিভাবে ইণ্ডাস্ট্রির সমস্যার সমাধান হবে? না, কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না ট্রেসি। সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা আরম্ভ হলো মাথায়। চোখ বন্ধ করে ফেললো ট্রেসি।

কতক্ষণ ওভাবে ছিলো, ট্রেসি জানে না; ওর তন্দ্রা ভাঙলো হাসানের ডাকে। কতকগুলো কাগজ ওর সামনে টেবিলের ওপর রেখে হাসান বললো, 'মিস ট্রেসি, আমি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছি। আপনার কাজ হচ্ছে এগুলোতে

সই করা। ব্যস।'

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স সম্পর্কে হাসানের মন্তব্য শোনার পর থেকেই ওর ওপর এক ধরনের অভিমান জমেছে ট্রেসির। কথাগুলো হাসান আগেই বলতে পারতো ওকে। কতো কথা বলেছে, শুধু ইণ্ডাস্ট্রির দুঃসংবাদটাই জানায়নি। ডিরেক্টরদের শেয়ার বিক্রির কথাও বলেনি। অথচ ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অনেক পুরনো। সভার শুরুতে হাসান হাসতে হাসতে যে উক্তি করেছিল, সেটার অর্থ এখন বুঝতে পারছে ও। বোঝাই যাচ্ছে, শেয়ার বিক্রির প্রসঙ্গে ওরা অনেক আগেই মতৈক্যে পৌঁছুছে। এখন ও একটা সই দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হাসান সে কথাই বলছে। তাহলে কথাটা ওকে আগে জানালে কী ক্ষতি হতো? ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতো। শুধু তাই নয়, এতো সময় নষ্টও হতো না। তার মানে, ও হাসানকে যতো আপন ভাবে, হাসান ওকে ততো আপন ভাবে না। কিন্তু ও তো ভেবেছিল ঠিক তার উল্টো।

'ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক, মি. হাসান। আপনি ছিলেন ডেভিড মেয়ারের ডান হাত। আপনি যদি মনে করেন আমি একটা সই দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, তাহলে সে সই দিতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।' মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো ট্রেসি।

কিন্তু কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে সই করার আগে ট্রেসির মুখ দিয়ে বেরুলো, 'আমি সই করলে কি হবে?'

উত্তর দিলো ভাদিম, 'ট্রেসি, যেসব ফার্ম কমিশনে কাজ করে, আমাদের সঙ্গে বারোটারও বেশি সেরকম আন্তর্জাতিক কমিশন পাওয়া ফার্মের সাথে কথা হয়েছে। ওরা একটা কনসোর্টিয়াম গঠন করে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের স্টক সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত। ভালো দাম দেবে ওরা।...'

'তার মানে ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীর মতো প্রতিষ্ঠান?' প্রশ্ন করলো ট্রেসি।

'হ্যাঁ। ঠিক ধরেছো।'

'ওদের প্রতিনিধিরা আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য হবে?'

'হ্যাঁ। সেটাই নিয়ম।'

'অর্থাৎ, ওরা মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে নিয়ন্ত্রণ করবে?'

'আমরা তখনো ডিরেক্টর থাকবো,' জানালো কার্লো।

ট্রেসি ভাদিমের ওপর চোখ রেখে বললো, 'তুমি বললে একটা কনসোর্টিয়াম শেয়ার সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওরা এখনো কাজ শুরু করেনি কেন?'

ট্রেসির দিকে তাকালো ভাদিম। কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'মানে? আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না।'

'ডিরেক্টরদের সবাই যদি বিশ্বাস করে যে আমাদের কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মেয়ার পরিবারের বাইরের মানুষের হাতে গেলে ব্যবসা ভালমতো চলতে পারবে, তাহলে আমি বুঝতে পারছি না এ কাজটি আগে করা হয়নি কেন?'

এক অদ্ভুত নীরবতা রাজত্ব বিস্তার করলো বোর্ডরুমে। কেউ কথা বলছে না।

কার্লো বললো, 'সিনোরিনা, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো এটা আমাদের পারস্পরিক সমঝোতার ওপর নির্ভর করে। বোর্ডের সবাইকে ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে।

'আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছো। তাহলে কে রাজি হয়নি?'

আবার নীরব হয়ে গেল বোর্ডরুম। এবারে নীরবতা আগের চেয়েও ভারি।

অবশেষে কথা বললো হাসান জহির। 'ডেভিড মেয়ার।'

নামটা শুনে চমকে উঠলেও ট্রেসি অনুভব করলো ওই নামটাই শুনতে চাইছিল ওর মন। এবং অকস্মাৎ ও আবিষ্কার করলো বোর্ডরুমে ঢোকার পর থেকেই যে অজানা বিষয়টি ওকে বিরক্ত করছিল সেটাকে এখন ও চিনতে পারছে। ডেভিড মেয়ারের মৃত্যুতে সবাই জানিয়েছে সহানুভূতি, কিন্তু ওদের প্রকাশ ভঙ্গিতে ছিলো কৃত্রিমতা; সেই ফাঁকটাই বিরক্ত করছিল ট্রেসিকে।

ফাঁকটাকে এখন সনাক্ত করতে পারছে ও। ওরা সবাই ওদের দুঃখী-দুঃখী চেহারার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল বিজয়ের আনন্দ। হাসান জহিরের কথায় তা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছেঃ 'আশা করি, সভা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে বেশি সময় নেবে না···আসল কথা হচ্ছে, এগুলোর কোনটাই আমাদের ইণ্ডাস্ট্রির জন্যে গৌরবের বিষয় নয়···প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে রেখেছি। আপনার কাজ হচ্ছে এগুলোতে সই করা···।' কিন্তু ওরা সবাই যদি মনে করে ওরা যা করতে চাইছে সেটাই ঠিক, তাহলে ওর বাবা কেন এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন? প্রশ্নটা বেশ জোরে উচ্চারণ করলো ট্রেসি।

'ডেভিড মেয়ারের নিজস্ব ধারণা ছিলো,' বোঝাতে চেষ্টা করলো বাওয়ার, 'তোমার বাবা অত্যন্ত জেদী আর একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ ছিলেন।'

'তার দাদা বাশেভিস মেয়ারের মতো,' ভাবলো ট্রেসি। বাশেভিস বলেছিল, ···শেয়াল যতোই বন্ধুতা দেখাক, মুরগীর খাঁচায় তাকে ঢুকতে দিতে নেই। একদিন না একদিন শেয়ালের খিদে লাগবেই···এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না···।' ডেভিড মেয়ারও রাজি হয়নি কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করতে। কেন? শুধু কি তার বুড়ো দাদার কথার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে, নাকি সত্যি সত্যি তার নিজস্ব আধুনিক ধারণা ছিলো?

ডেভিড মেয়ার আধুনিক যুগের মানুষ। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে সাম্রাজ্যে রূপ দিয়েছেন তিনি। কোনো মিথ্যা মোহ কিংবা কুসংস্কারকে পাত্তা দিতে পারেন না তিনি। ইণ্ডাস্ট্রির আজকের চেহারা দেখলে নিশ্চয় বাশেভিসও অমন উক্তি করতেন না। তাহলে কেন ওর বাবা শেয়ার বিক্রি করতে দিতে রাজি হয়নি। ভাবনার অতল সমুদ্রে ডুব দিলো ট্রেসি। কেন···কেন···কেন?

ভাবতে ভাবতে প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেল ট্রেসি। নিশ্চয় মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সমস্যার সমাধান শেয়ার বিক্রিতে সীমাবদ্ধ নয়; ডেভিড মেয়ার হয়তো সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই রাজি হননি ওদের কথায়।

ট্রেসিকে চিন্তিত দেখে কথা বললো কার্লো। 'সিনোরিনা, বিশ্বাস করো, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, ব্যবসার ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ো না; তুমি

মেয়েমানুষ, এসব বুঝবে না।'

ঠাণ্ডা গলায় বললো ট্রেসি, 'আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'ট্রেসি, কেন নিজের সমস্যা বাড়াচ্ছো?' হতাশ কণ্ঠে বললো বাওয়ার, 'শেয়ার বিক্রি হলে এতো টাকা পাবে যে তুমি এবং তোমার বংশধররা তা খরচ করেও শেষ করতে পারবে না। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় গিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারো।'

বাওয়ারের কথায় যুক্তি আছে, ভাবলো ট্রেসি। কেন ও সমস্যা বাড়াচ্ছে? টেবিলের ওপর রেখে যাওয়া হাসানের কাগজগুলোতে সই করলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না। তারপর একেবারে মুক্ত ও।

ধৈর্য হারিয়ে ভাদিম বললো, 'ট্রেসি, আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। তোমার করার কিছু নেই।'

আর তখনি ট্রেসির মন বললো, না, ওরও করার কিছু আছে। যেমন ছিলো ওর বাবার। এখনি ও এখান থেকে চলে যেতে পারে; তারপর কোম্পানীকে নিয়ে ডিরেক্টরদের যার যা ইচ্ছে তাই করুক। অথবা ও বাবার আসনে বসে জানার চেষ্টা করতে পারে, কেন ওরা শেয়ার বিক্রি করার জন্যে এতো ব্যতিব্যস্ত হয়েছে, কেন ওরা ওর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে?

হাসানের দিকে তাকালো ট্রেসি। বোঝার চেষ্টা করলো, কি ভাবছে ও। কিন্তু হাসানের চেহারা আগের মতোই উদাসীন। 'কী আশ্চর্য মানুষ! অথচ ওর ওপর ভরসা করেই আমি নিজেকে এতো সংযত রেখেছি।' অভিমানগুলো আস্তে আস্তে আক্ষেপে পরিণত হলো ট্রেসির।

এদিকে সবাই তাকিয়ে আছে ট্রেসির মুখের দিকে, অপেক্ষা করছে কখন ও সম্মতি জানাবে।

'আমি সই করবো না,' ধীরে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করলো ট্রেসি।

চমকে উঠলো ঘরের সবাই। বোমা ফাটলেও বোধহয় এতো চমকাতো না কেউ। নীরবতা, পিনপতন নীরবতায় ডুবে গেল বোর্ডরুম।

'ট্রেসি, আমি তোমার মতিগতি বুঝতে পারছি না,' বললো বাওয়ার।

হতাশায় ছাই হয়ে গেছে ওর মুখ। 'তোমাকে অবশ্যই সই করতে হবে। সবকিছু প্রস্তুত।'

খেপে গিয়ে ভাদিম জানালো, 'বাওয়ার ঠিক বলেছে। তোমাকে সই করতেই হবে।'

'তুমি কেন সই করছো না?' জানতে চাইলো কার্লো।

'সবকিছু ভেবে দেখতে আমার কিছু সময় প্রয়োজন,' কারো দিকে না তাকিয়ে বললো ট্রেসি। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো বোর্ডের সদস্যরা।

'কতদিন, সিনোরিনা?' জানতে চাইলো কার্লো।

'এখনি বলতে পারবো না। সবকিছু আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।'

টেবিল চাপড়ে বাওয়ার বললো, 'জাহান্নামে যাও তুমি। আমরা এতদিন অপেক্ষা...'

ওকে কথা শেষ না করতে দিয়ে হাসান বললো, 'আমার মনে হয় মিস মেয়ার ঠিক কথাই বলেছেন।'

সবাই তাকালো হাসানের দিকে। যেন গিলছে ওর কথা।

'আমি হাসানের সঙ্গে একমত', বললো রিচার্ড।

'রিচার্ড, আমরা কে কি বলছি তাতে কিছু যায় আসে না। দেখাই যাচ্ছে, ট্রেসি এখন কারো হাতের খেলার পুতুল,' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো ভাদিম।

'সিনোরিনা, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তোমার সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি জানালে আমরা খুশি হবো,' অনুরোধ জানালো কার্লো।

'অবশ্যই। কথা দিচ্ছি।'

'মিস পুনার, আজকের সভা এখানেই শেষ হচ্ছে,' ঘোষণা করলো হাসান।

ছয়

বোর্ডরুম থেকে সরাসরি ডেভিড মেয়ারের অফিস রুমে ঢুকলো ট্রেসি। সময় এবং পরিস্থিতি কতো পাল্টে ফেলে মানুষকে। জুরিখে ও এসেছিল ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় শুধুমাত্র হাজির হতে; তখন ইচ্ছে ছিলো, সভার কাজ যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে নিজের জগতে ফিরে যাবে, যে জগতে কেবল ও, হাসান আর বাবার স্মৃতি; অথচ বোর্ডের সভা দীর্ঘায়িত হয়েছে ওর কারণে, আর সভা শেষ হবার পর নিজের জগতে না ফিরে ও স্বেচ্ছায় ঢুকলো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের দ্বন্দ্ব-মুখর ব্যবসায়িক জগতে।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে ঘিরে কোনো মিথ্যে মোহ ট্রেসির নেই। বাশেভিস মেয়ারের উইলের সংকীর্ণতা এবং ওর একমাত্র কন্যা-সন্তান হয়ে জন্মাবার কারণে আজ হোক কাল হোক ইণ্ডাস্ট্রির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাইরের মানুষের হাতে যাবেই; কিন্তু ও জানতো না, ওর হাত ধরে বাইরের মানুষ ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢোকার অনেক আগেই ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যরা একে বাইরের মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্যে একজোট হয়েছে; এবং এ ব্যাপারে ডিরেক্টররা সিরিয়াস।

এই বাস্তব সত্য আজকের সভায় জানতে পেরেছে ট্রেসি। অর্থাৎ, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সে আগন্তুক নিয়ে আসায় ওর আর কোনো ভূমিকা নেই। সেটা ওর জন্যে

মস্ত বড় সান্ত্বনা। না চাইতেই তা পেয়েছে ট্রেসি, যেমন পেয়েছে বাবার আসন। সে কারণে ওর আজকের ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত হতে পারতো, যেমনটা মনে মনে চেয়েছিল ও। কাগজপত্রগুলোতে সই করে ও হাসানকে নিয়ে ফিরে যেতে পারতো ওর নিজের জগতে।

কিন্তু প্রথমেই বাদ সাধলেন ওর বাবা, ডেভিড মেয়ার। তিনি ডিরেক্টরদের শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবে রাজি হননি। ব্যবসায়ী ডেভিড মেয়ার সম্পর্কে ট্রেসির ধারণা অত্যন্ত উঁচু। সে কারণে ওর বিশ্বাস, নিশ্চয় এর পিছনে বাবার কোনো জোরালো যুক্তি ছিলো। বাবা আজ নেই। কিন্তু তাই বলে তার অভিমতকে বাতিল করতে পারে না ট্রেসি। ওকে জানতেই হবে সত্য। না জানা পর্যন্ত ও সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। না। না। না।

কিন্তু শুধু বাবা নয়, হাসানের আচরণও খেপিয়ে তুলেছে ট্রেসিকে। আগেই ওকে সব কথা বলতে পারতো হাসান। কেন বলেনি? সে কথাও ওকে শুনতে হবে এক্ষুণি।

জুরিখে এজন্যেই থেকে গেল ট্রেসি।

ডেভিড মেয়ারের অফিস রুমে ঢুকে ট্রেসির মনে হলো এযুগের একজন ডাকসাইটে শিল্পপতি নয়, ও ঢুকেছে একজন শিল্পীর ঘরে! ঘরটা বিশাল। দামী দামী আসবাবে সাজানো। একজন শিল্পপতির অফিস কামরায় যা যা থাকা প্রয়োজন তার সবই আছে। কিন্তু এ কামরার বৈশিষ্ট্য শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা বিভিন্ন মূল্যবান ছবি। বাবার নকশা-করা ডেস্কের পিছনে বাশেভিস মেয়ার এবং গোল্ডা মেয়ারের যুগল পোর্ট্রেট।

অফিস রুমকে ঘিরে আলাদা আলাদা ভাবে ড্রেসিংরুম, বাথরুম, এক্সিকিউটিভ স্যুট, জিমনেসিয়াম, বার্বার সপ, ডাইনিংরুম। প্রতিটি ঘরে যাবার দরজা আলাদা। ডাইনিংরুমে একসঙ্গে একশো জন লোক খেতে পারবে। এছাড়া আছে একটা ব্যক্তিগত ডাইনিংরুম, ম্যুরাল দিয়ে সাজানো।

কথা প্রসঙ্গে পুনার ট্রেসিকে জানালো, 'দিনে দুজন এবং রাতে একজন

বাবুর্চি সবময় ডিউটিতে থাকে। লাঞ্চ কিংবা ডিনারে তোমার অতিথির সংখ্যা বারোজনের বেশি হলে ওদের জন্যে দুঘন্টার নোটিসই যথেষ্ট।'

বাবার ডেস্কে বসে দিশেহারা হয়ে পড়লো ট্রেসি। ডেস্কটা মেহগনি কাঠের। চকচক করছে কালো রঙ। ডেস্কের ওপর স্তূপ হয়ে আছে কাগজ, স্মারক, পরিসংখ্যান, প্রতিবেদন। ও বুঝতে পাচ্ছে না কেমন করে কোথা থেকে শুরু করবে কাজ।

পাশে, কনসোল টেবিলের ওপর ইন্টারকম বোতামগুলোর দিকে তাকালো ট্রেসি। একটার গায়ে লেখাঃ হাসান জহির। নামটার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বোতাম টিপলো ও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকলো হাসান। হাসছে। চেহারায় নেই আগের সেই উদাসীনতা, নিষ্ঠুরতা। অনেক জীবন্ত দেখাচ্ছে ওকে। এই তো ওর হাসান। ওর লাল রিবনের স্রষ্টা।

'ওয়েলকাম টু মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স, মিস ট্রেসি,' ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে বললো হাসান।

'ধন্যবাদ, মি. হাসান। বসুন, প্লীজ।'

'আপনাকে সত্যি সত্যি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মতো দেখাচ্ছে।'

'কেন?'

'ডিরেক্টররা কেউ আশা করেনি আপনি ওদের ওপর বোমা ছুড়ে মারবেন।'

'বোমা!'

'হ্যাঁ। ওরা ভেবেছিল আপনি লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওদের প্রস্তাব মেনে নেবেন আর টুঁ শব্দটি না করে কাগজগুলোতে সই করবেন।'

'আমি কি ভুল করেছি?'

'মিস ট্রেসি, প্রশ্ন এখানে ভুল বা ঠিক নিয়ে নয়। প্রশ্ন উঠেছিল সিদ্ধান্ত নিয়ে। আপনি আপনার অভিমত জানিয়েছেন, ব্যস। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে আপনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?'

'সেটা আপনাকে জানাবো বলেই ডেকেছি। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে

আমার প্রশ্ন, কেন আপনি আমাকে ইণ্ডাস্ট্রির সমস্যাগুলোর কথা জানাননি?'

'খেপে আছেন, দেখছি। ঠিক আছে, বলছি। প্রথম কারণটা অফিসিয়াল। আমি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের বেতনভুক কর্মচারী হয়ে এর গোপন সংবাদ বাইরের কাউকে জানাতে পারি না। আপনি এত দিন বাইরের লোক ছিলেন, কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি। পরের কারণটা ব্যক্তিগত। আমি চাইনি কথাগুলো আপনাকে আগে জানিয়ে আপনার মতামতকে প্রভাবিত করি। আমি আপনার নিজস্ব মতামত চেয়েছি। আমার বিশ্বাস আপনার তা আছে। কি, হলো?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমি ভেতরের লোক। এবার নিশ্চয় আপনার বলতে বাধা নেই। আমি তাড়াতাড়ি এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।'

'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারবেন কিনা জানি না। তবে কথাগুলো শোনাচ্ছি।

'প্রথম ঘটনাটি ঘটে চিলিতে। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের একটা রাসায়নিক কারখানা হঠাৎ করে বিস্ফোরিত হয় সেখানে। দশ বর্গ মাইল এলাকা বিষাক্ত হয়ে ওঠে দূষিত গ্যাসে। পঞ্চাশ জন মারা যায়। দুশো জনকে পাঠাতে হয় হাসপাতালে। ওই এলাকার সমস্ত পশু-পাখি মারা পড়ে। দূষিত হয়ে ওঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ। এলাকার লোকজনকে সরানো হয় অন্য এলাকায়। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের নামে মামলা দায়ের করা হয় আদালতে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়ায় কয়েক শো মিলিয়ন ডলার।

'পরপর চারটি গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়ে যায়। এগুলোর পিছনে খরচ হয়েছিল দুশো মিলিয়ন ডলারের মতো। আপনি হয়তো জানেন, কোনো নতুন ওষুধ তৈরি করতে হলে তার ফর্মুলা বের করার জন্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। কখনো কখনো এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বছরের পর বছর ধরে চলে। যেসব বিজ্ঞানী জড়িত থাকেন তাদের বেতন, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ নগদ অর্থে পরিশোধ করে ইণ্ডাস্ট্রি। গবেষণা শেষ হবার পর তার ফর্মুলা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইণ্ডাস্ট্রি ওষুধটি বাজারে ছাড়ার অনুমতি চেয়ে

সরকারের কাছে আবেদন করে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ওষুধের ফর্মুলাও জমা দিতে হয়।

'এসব প্রজেক্ট যে সবসময় বাস্তবায়িত হয় তা কিন্তু নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ফর্মুলা ঠিক থাকা সত্ত্বেও ওষুধগুলো মানুষের শরীরের উপযোগী নয়; বাতিল হয়ে যায় প্রজেক্ট, কিন্তু খরচ ঠিকই গুনতে হয় ইণ্ডাস্ট্রিকে।

'আমি যে চারটি প্রজেক্টের কথা বললাম, সেগুলো কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে অন্য কারণে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়ার আবেদনপত্র জমা দিতে গিয়ে দেখেছে অন্য কোনো ফার্ম তার কয়েকদিন আগে হুবহু একই ফর্মুলা নিয়ে ওষুধ বাজারে ছাড়ার অনুমতি চেয়েছে।

'এরপর, এক জাহাজ ভর্তি বিষাক্ত ওষুধকে অন্য ওষুধের লেবেল লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। ব্যাপারটি জানাজানি হবার পর ওষুধগুলো বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার আগেই পৃথিবীর দেশে দেশে মারা পড়ে কয়েক হাজার নিরীহ মানুষ। ক্ষতিপূরণের অঙ্ক পাঁচশো মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এর জের এখনো চলছে।

'তারপর, কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও এক ল্যাবরেটরী থেকে বেশ কিছু মারাত্মক বিষ চুরি হয়। এবং কয়েক ঘন্টা পর খবরটা বেশ কয়েকটা দৈনিকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তথ্য সরবরাহকারীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এতে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দেয়।'

কথাগুলো শোনার পর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো ট্রেসির। মনে পড়ছে, এরকম খবর ও পড়েছে কাগজে। কিন্তু তখন বুঝতে পারেনি এগুলোর জন্যে এতো বিপুল মাশুল দিতে হয়েছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে।

'কিন্তু এগুলো তো দুর্ঘটনা, একটা বড় ইণ্ডাস্ট্রির জীবনে এমন ঘটতেই পারে,' মন্তব্য করলো ট্রেসি।

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। প্রথমে আমাদেরও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু ঘটনাগুলো পরপর ঘটতে থাকায় ডেভিড মেয়ার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সে সময় তার ধারণা জন্মে, এগুলো দুর্ঘটনা নয়। আমি তাকে সময় নষ্ট

না করে ঘটনাগুলো তদন্ত করার জন্যে পেশাদার গোয়েন্দা লাগানোর অনুরোধ করি। আমার প্রস্তাব ভালো লাগে তাঁর। একদল গোয়েন্দাকে কাজে লাগান তিনি। কিন্তু এ পর্যন্তই। এরপর আমি আর কিছু জানি না। ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। সম্ভবত তাদের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। তারপর শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিতেন হয়তো। একটা কথা আপনার জেনে রাখা ভালো, শেয়ার বিক্রি ছাড়া বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে না।'

'ধন্যবাদ, মি. হাসান। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নই। ঘটনাগুলো দুর্ঘটনা হলেই কেবল শেয়ার বিক্রির প্রশ্ন উঠবে, নয় কি? তবে আমার জানার বিষয় আপাতত অন্য। বাবা যদি গোয়েন্দা দল লাগিয়ে থাকেন তাহলে তাদের রিপোর্ট এখন তারা কাকে দেবে?'

'আপনার প্রশংসা না করে পারছি না। হ্যাঁ, শেয়ার বিক্রি সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত নির্ভুল। কিন্তু গোয়েন্দা দলের রিপোর্ট সম্পর্কে আমি যা বলবো তা আমার অনুমান। ছমাস আগে গোয়েন্দা দল লাগানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের প্রাথমিক খসড়া আসার কথা। ডেভিড মেয়ার তা পেয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাকে কিছু জানাননি। আবার এমনও হতে পারে, এখনো রিপোর্ট আসেনি। সে ক্ষেত্রে তারা তাদের রিপোর্ট আপনাকে দেবে। এখন আপনার অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।'

'ততদিন আমি কি করবো?'

'বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আপনার উচিত হবে ইণ্ডাস্ট্রিকে চেনা। হেডকোয়ার্টার থেকেই শুরু করতে পারেন। আপনি কি কোম্পানীর কাঠামো সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না। আপনি সাহায্য করবেন?'

'অবশ্যই। বলছি। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান শুধু ওষুধই বানায় না। এখন এর উৎপাদন তালিকায় আছে রাসায়নিক পদার্থ, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেয়ার স্প্রে, কীটনাশক, প্রসাধনী, বায়ো-ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, অ্যাডহেসিভ, প্লাস্টিক বিস্ফোরক, দালান রক্ষা

করার মালমসলা। এ ছাড়া আছে একটা খাদ্য বিভাগ, পশু–পাখি রক্ষার বিভাগ। শুধু তাই নয়, কয়েকটি রিসার্চ ম্যাগাজিনও ইণ্ডাস্ট্রির অর্থে বের করা হয়।

'একশোটিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে আছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ফ্যাক্টরী, হোল্ডিং কোম্পানী। রিসার্চ কেন্দ্রের সংখ্যা দশ। সেলস এক্সিকিউটিভদের সংখ্যা কয়েক হাজার। কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা গুনতে যাওয়া বোকামি। আরো শুনবেন?'

'না, না। মাথা ধরে গেছে। চলুন এবার চোখ দিয়ে দেখি যতটুকু দেখা যায়।'

'যাবো। কিন্তু আপনি ক্লান্ত। ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিন। আমি খবর দেবো।'

হাসানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হেডকোয়ার্টারের ফ্যাক্টরীগুলো দেখছে ট্রেসি। ষাট একর এলাকায় পঁচাত্তরটি বিল্ডিং, কয়েক ডজন ফ্যাক্টরী।

এক এক করে হাসান ট্রেসিকে দেখালো ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্টস, রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, টক্সিকোলজি ল্যাবরেটরী, স্টোরেজ প্লান্ট। এরপর ওরা এলো সাউণ্ড স্টেজে। এখানে উৎপাদন বিভাগ, গবেষণা এবং বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞাপনের জন্যে প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। 'এখানে যতো ফিল্ম ব্যবহার করা হয়,' মুচকি হেসে হাসান মন্তব্য করলো, 'হলিউডের প্রধান স্টুডিওগুলোও ততো ফিল্ম ব্যবহার করে না।'

হাঁটতে হাঁটতে হাসান ট্রেসিকে প্রশ্ন করলো, 'মিস মেয়ার, আপনি জানেন এখানে কতোজন বিজ্ঞানী কাজ করেন?'

'না তো।'

'তিনশো জনেরও বেশি। সবাই পিএইচডি।'

'তাই?'

'হাঁ। এখানে একটা বিল্ডিং আছে, মানুষ যেটার নাম দিয়েছে একশো মিলিয়ন ডলার বিল্ডিং।'

'মানে?'

'চলুন না, নিজের চোখেই দেখবেন।'

হাসানের বিশেষণযুক্ত বিল্ডিংটা ইটের; চত্বরের এক কোণে, বেশ নির্জন। ইউনিফরম বিহীন একজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে, হাতে রাইফেল। হাসান ওর সিকিউরিটি পাস দেখিয়ে ট্রেসিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। একটা লম্বা করিডোরের শেষ মাথায় ইস্পাতের দরজা। সেখানেও একজন গার্ড। দুটো চাবি ব্যবহার করে দরজা খুললো ও।

রুমের ভেতরে ঢুকলো হাসান আর ট্রেসি। কোনো জানালা নেই কামরায়। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু শেলফ আর শেলফ। থরে থরে সাজানো বোতল, জার, টিউব।

'মানুষ এর নাম একশো মিলিয়ন ডলার দিয়েছে কেন?' ঘরের মধ্যে কোনো জাঁকজমক না দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো ট্রেসি।

'ওই যে বোতল, জার আর টিউবের ভেতর বিভিন্ন রঙের যৌগিক পদার্থগুলো দেখছেন, ওগুলো সংরক্ষণ করার খরচ কখনোই শ মিলিয়ন ডলারের নিচে নামে না, তাই। ওগুলোর কোনো নাম নেই, শুধু নম্বর আছে। ওগুলো থেকে ফাইনাল প্রডাক্ট আসেনি। প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

'তাহলে ওগুলো নষ্ট করা হয় না কেন?'

'বুঝতেই পারছেন, দীর্ঘ গবেষণার ফসল পদার্থগুলো। এমনও হতে পারে নতুন কোনো গবেষক এসে এগুলো থেকেই একদিন কিছু আবিষ্কার করবে।'

ছয়দিন ধরে ঘুরে ঘুরে ট্রেসি দেখলো লস রুম, ক্যাপসুল রুম, গ্লাস ব্লোয়িং ফ্যাক্টরী, একটা স্থাপত্য কেন্দ্র···

একদিন এক রিসার্চ বিল্ডিঙের করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌঁছুলো একটা দরজার সামনে। দরজার মাথায় লেখাঃ 'প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত।'

দরজা খুলে ট্রেসিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো হাসান। প্রথমে একটা ফাঁকা ঘর। সেটার দরজা খুলতেই ওরা ঢুকলো অন্ধকার–প্রায় এক ঘরে। শ পাঁচেক খাঁচা। সেগুলোর ভেতরে বিভিন্ন প্রাণী। বিকৃত চেহারা। ওদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাই ওই অবস্থা। কেউ যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, ছটফট

করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছে খাঁচার ভেতর, কেউ ঝিমুচ্ছে, কতকগুলো ধুকপুক করছে।

বাতাস গরম, ভ্যাপসা। দুর্গন্ধে, শব্দে অস্থির হয়ে পড়লো ট্রেসি। মনে হলো নরকে ঢুকে পড়েছে। কিছুই সহ্য করা যাচ্ছে না।

একটা খাঁচার সামনে দাঁড়ালো ট্রেসি। ভেতরে একটা বিড়ালের বাচ্চা। মাথায় খুলি নেই, মগজ বেরিয়ে আছে।

'এখানে···এখানে কি হচ্ছে?' চিৎকার করে উঠলো ট্রেসি।

অন্য এক খাঁচার সামনে একজন লম্বা, দাঁড়িঅলা যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোটবইয়ে লিখছিল। ছুটে এসে ও বললো, 'আমরা একটা নতুন ঘুমের বড়ি তৈরির পরীক্ষা করছি।'

'ঈশ্বর আপনাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুক। মি. হাসান, প্লীজ আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন। আমি এখানকার কিছুই সহ্য করতে পারছি না। প্লীজ।'

দৌড়ে এসে ট্রেসিকে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাসান ডাকলো, 'মিস মেয়ার, হউ অলরাইট?'

কাঁপছে ট্রেসি।

ওকে কোলে নিয়ে হাসান যুবককে বললো, 'প্লীজ, তাড়াতাড়ি গাড়ি আনতে বলুন।'

ফেরার পথে হাসানের কোলে ট্রেসি অনুভব করলো, ঘামছে ও। হাসান ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে আবার ডাকলো, 'মিস মেয়ার, আমি এখন ভেবে অবাক হচ্ছি বোর্ড মিটিং-এ আপনি অতো শক্ত হতে পারলেন কেমন করে। আপনি জানেন, মেয়ার ইণ্ডাস্ট্রি চিরকাল পরিবারের হাতে থাকবে না।'

'হাসান, আমি আর ইণ্ডাস্ট্রি চালাবো না। তুমি আমাকে আদর করো। আমি শেয়ার বিক্রির অনুমতি দেবো। তুমি চালাতে পারলে চালাও। আমাকে জড়িয়ো না। আমাকে বিয়ে করো।'

ট্রেসি!'

'আমাকে বাধা দিও না, হাসান। আমি প্রেমে পড়েছি। আমাকে না বলো না।'

'ভেবে দেখুন, প্লীজ, ভালভাবে ভেবে দেখুন। আমি বলছি, সত্যি বলছি, আপনি ইণ্ডাস্ট্রি চালাতে পারবেন। আপনি আমাকে ডাকলে আমি না বলতে পারবো না। আমাদের বিয়ে হলেও আপনি ...'

'না, হাসান। তুমি চালাবে। আমি হবো তোমার গিন্নী।'

'ট্রেসি!'

'হ্যাঁ। হাসান। আমি ঘরে পৌঁছেই পুনারকে সব আয়োজন করার জন্যে বলবো। মেয়ার পরিবারের সবাইকে জানাতে হবে আমি শেয়ার বিক্রি করতে রাজি। আমরা মধুচন্দ্রমায় কোথায় যাবো?'

'ব্রাজিল।'

'না। সার্ডিনা।'

'তাই হবে।'

ট্রেসিকে চেয়ারে বসিয়ে বেল টিপলো হাসান।

ঘরে ঢুকলো পুনার।

'পুনার, তাড়াতাড়ি একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। তুমি প্রস্তুত হও। ট্রেসি, শুরু করো। আমি আমার ঘর থেকে আসছি।'

'তাড়াতাড়ি এসো।'

ওদের কথাবার্তার ধরন দেখে সন্দেহ সন্দেহ চোখে হাসান আর ট্রেসির মুখের দিকে তাকাতে লাগলো পুনার।

'পুনার, অবাক অবাক চোখে কি দেখছো? আমরা এখন বিবাহিত। সেজন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম ড্রাফট করতে বলছি।'

'রাখো তোমাদের ড্রাফট। একটু নেচে নি।'

নিতম্ব দুলিয়ে নাচতে লাগলো পুনার।

'আস্তে আস্তে, পুনার। নাচার সময় আমাদের। তুমি তাড়াতাড়ি কোম্পানীর ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে, বলো। আমি লিখছি।'

'লিখোঃ প্রিয় বোন/ভাইয়েরা…'

বেজে উঠলো হাসানের টেলিফোন। রিসিভার তুলে হাসান বললো, 'হ্যালো।'

'মি. হাসান?'

'হ্যাঁ।'

'হামবুর্গ থেকে বলছি। ইণ্ডাস্ট্রিতে সামান্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। সবাই আপনাকে চাইছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে। আপনি হ্যাণ্ডেল করলে সুবিধা হতো।'

'আমি আসছি।'

ডিক্টেশন বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেসি।

'টেসি, নাথিং সিরিয়াস। আমি হামবুর্গ যাচ্ছি। তুমি টেলিগ্রাম পাঠাও। আমি পৌঁছেই খবর দেবো, কবে ফিরছি।'

'তুমি খবর না দেয়া পর্যন্ত আমি কাজ করবো না। কিন্তু সত্যিই বলছো, নাথিং সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'ঠিক আছে, পুনার। তুমি তোমার ঘরে যাও, আমরা এখন বিবাহিত নারী-পুরুষের মতো শুভেচ্ছা জানাবো।'

'অলরাইট, বস্।'

হামবুর্গে পৌঁছে টেসিকে টেলিফোন করলো হাসান।

'টেসি, আমি দুদিন পর ফিরতে পারবো। তুমি সার্ডিনায় যাও। ওখানে উইক এণ্ড করো। আমি সরাসরি ওখানে যাবো। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছো?'

'না। তুমি না আসা পর্যন্ত কিছু করছি না। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু। আমি সার্ডিনা যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। হামবুর্গের খবর কি?'

'কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। গুড ইভিনিং।'

'গুড ইভিনিং। আমি রওনা হচ্ছি।'

'পুনার, আমি সার্ডিনা যাচ্ছি। তুমি সব ব্যবস্থা করো। একটা কথা, তুমি যা শুনেছো এখনি কাউকে জানাবে না। আমি সোমবারে ফিরে টেলিগ্রাম পাঠাবো। আমি যাবার পর, চারজন ডিরেক্টরকে জানিয়ে রাখবে আমি সার্ডিনায় আছি। ব্যস। এখন তাড়াতাড়ি আমার যাবার ব্যবস্থা করো।'

'ট্রেসি, মি. মেয়ার মন্ট ব্লঙ্কে যে লাগেজ নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকদিন হলো সেটা ফেরত এসেছে। ওটা কি তোমার লাগেজে দেবো?'

'হ্যাঁ।'

ঘর ছেড়ে চলে গেল পুনার। চেয়ারে হেলান দিলো ট্রেসি। বেশ ক্লান্ত লাগছে। একটু বিশ্রাম দরকার। কিছু ভালো লাগছে না। কোথায় হানিমুন করবে, তা না, ওকে যেতে হচ্ছে একা একা সার্ডিনায়।

একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল, কিন্তু ভেঙে গেল টেলিফোনের শব্দে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টেলিফোনটা বাজছে।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললো ট্রেসি।

'হ্যালো।'

'মিস মেয়ার বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি মন্ট ব্লঙ্ক থেকে পুলিস সার্জেন্ট বলছি। ঘটনাটা রহস্যময় মনে হচ্ছে। গাইডদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমরা এখনো কাজ করছি। কিন্তু আর একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মি. মেয়ারের সঙ্গে এখানে আর একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন...'

'আর একজন ভদ্রলোক! আপনি কি বলছেন, সার্জেন্ট?'

'হ্যাঁ। আর তিনি হচ্ছেন যে ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে শ্যামনিজে এসেছিলেন, মি...'

'না।'

'হ্যাঁ। মি. হাসান জহির।'

নির্বাক হয়ে গেল ট্রেসি। এ মিথ্যে।

'মিস মেয়ার, আপনি ঠিক আছেন?'

'সার্জেন্ট...'

'মিস মেয়ার, আমরা মি. হাসানকে জেলে নেবার কাজে হাত দিতে চাই।'

'সার্জেন্ট, এ মিথ্যে। হাসান ওখানে যেতেই পারে না। বাবার তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।'

'কিন্তু অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি, তাকে বাইরে...'

'আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু সাবধান। আপনাকে লিখিত নোট দিতে হবে।'

'ধন্যবাদ। এক্ষুণি নোট পাবেন।'

মাথা ঝিমঝিম করছে। এ হতে পারে না। ওর প্রেম, প্রেমিক...

ঘরে ঢুকে পুনার দেখে, ট্রেসি কাঁদছে।

'ট্রেসি, খারাপ লাগছে।'

'না, পুনার। ধন্যবাদ। সব রেডি!'

'হ্যাঁ। আমি তোমার সঙ্গে আসবো?'

'না। ধন্যবাদ। সার্ডিনায় কোনো খবর পাঠাবার দরকার নেই। আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই। আসি।'

'হ্যাভ অ্যা নাইস জার্নি। গুড ইভিনিং।'

'গুড ইভিনিং।'

পরের দিন ভোরে, হামবুর্গের রিপারবান বেশ্যাপল্লীতে পুলিস একজন আঠারো বছর বয়স্ক তরুণীর লাশ উদ্ধার করলো। নগ্ন। শরীরে যৌন মিলনের চিহ্ন। গলায় লাল রিবন। ঘরে পাওয়া গেল একটা ভিডিও ক্যামেরা। ক্যামেরার

ভেতরে একটা ক্যাসেট।

ভিসিআর-এ ক্যাসেটটা চালিয়ে হামবুর্গে পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা দেখলো, ক্যাসেটে একটি যৌনমিলনের দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। যাকে বলে পর্নো ফিল্ম। নীল ছবি।

পাত্র-পাত্রী তিনজন। দুজন পুরুষ। একজন নারী। নারী ওই মৃতা তরুণী। দুজন পুরুষের একজন দর্শক। মাথায় হ্যাট। চোখে কালো চশমা। ঠোঁটে সিগার। বাঁ হাতে মদের গ্লাস। দ্বিতীয় পুরুষ দৃশ্যের নায়ক।

বোতাম টিপতেই শুরু হলো নীল ছবি।

একটা ছোট্ট ঘরে বিছানার ওপর চিত হয়ে নগ্ন অবস্থায় শুয়ে আছে ওই মৃতা তরুণী, তখন জীবিত। গলায় লাল রিবন। পাশে একই অবস্থায় শুয়ে দ্বিতীয় পুরুষ।

ডান হাতের তর্জনী তুলে দর্শক চিৎকার করলো, 'স্টার্ট।' হ্যাট আর চশমার জন্যে চেনা যাচ্ছে না লোকটাকে।

একটা একটা করে খেলা শেষ করে চূড়ান্ত লীলায় মিলিত হলো তরুণী আর দ্বিতীয় পুরুষ।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জীবন্ত ছবি দেখছে দর্শক। মুখে বিজয়ের হাসি।

চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নায়িকা। এ সময় দর্শকের দিকে তাকালো নায়ক।

'ইয়েস।' মাথা দোলালো দর্শক।

নায়িকা কিছু বোঝার আগেই ওর টুঁটি চিপে ধরলো নায়ক।...

আর কোনো দৃশ্য নেই।

সাত

সার্ডিনা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিলো ট্রেসি। ওর প্রিয় সার্ডিনা। যেখানে শুধু প্রকৃতি আর প্রকৃতি। ওর যতো স্মৃতি তা এই সার্ডিনা ভিলাকে ঘিরেই। এখানেই পরিচয় বাশেভিসের সঙ্গে। কিন্তু এ কোন সার্ডিনায় এলো ও?

সার্ডিনায় ট্রেসি আসতে চেয়েছে ওর হানিমুন করতে। কিন্তু জীবন যেদিন কানায় কানায় পূর্ণ হলো সেদিনই ঘটলো বিচ্ছেদ। বিয়ের চারার মাথাটাকে থেঁতলে দিলো শ্যামনিজের ফরাসী সার্জেন্ট।

জীবন থেকে নিবার্সন চাইছে ট্রেসি। গত আঠারো দিনে যা ঘটেছে আগাগোড়া সেগুলোকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। এতো দ্রুত ঘটেছে ঘটনা নিঃশ্বাস নেবার সময় পায়নি ও।

পয়লা সেপ্টেম্বরে দেখা হলো হাসানের সঙ্গে। সেদিন হস্টেলে ফিরে অনুভব করছে প্রেম এসেছে জীবনে। পাঁচ তারিখে শুনলো মারা গেছে বাবা। পরের দিন মন্ট ব্লঙ্কে পা দিয়ে জানলো বাবার মৃত্যু দুর্ঘটনা নয়, সাজানো। এগারো তারিখে বাবার ভূমিকায় জুরিখে এসে দেখলো মেয়ার পরিবার মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের শেয়ার বিক্রি করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আর আজ ওর প্রেম যখন স্বীকৃতি পেলো, বাসর ঘরের জন্যে প্রস্তুত হলো ওর কুমারী শরীর, সে মুহূর্তে খবর এলো, ওর হাসান

খুনী। 'না।' চিৎকার করে উঠলো ট্রেসি।

'সিনোরিনা, তুমি কিছু বলছো,' গাড়ি থামিয়ে জানতে চাইলো বুড়ো ইটালিয়ান ড্রাইভার।

'না। দুঃখিত, সিনর। আমি সার্ডিনায় এলে আমার শৈশবে ফিরে যাই। গান গাইতে ইচ্ছে করে।'

'ঠিক বলেছো। সার্ডিনার বাতাসে জাদু আছে।'

'গ্রাসিয়া।'

'প্রেগো।'

চলতে শুরু করলো ট্যাক্সি।

না। হাসান খুনী নয়। হতে পারে না। আমি পবিত্র। আমার প্রেম পবিত্র। আমাদের ভালবাসা মিথ্যে হতে পারে না। হাসান আমার চোখের সামনে খুন করলেও আমি বিশ্বাস করতে পারবো না।

ভিলার সামনে ট্যাক্সি থামিয়ে দরজা খুললো ড্রাইভার। ট্রেসি পার্স খুলে দেখে, সঙ্গে কোনো লিরা আনেনি ও। একটা একশো ডলারের নোট তুলে দিলো ও ড্রাইভারের হাতে।

'গ্রাসিয়া, সিনোরিনা। বোনাসেরা।'

'বোনাসেরা।'

ফিরে গেল ড্রাইভার। তালা খুলে ভিলায় ঢুকলো ট্রেসি।

ভিলা অন্ধকার। কেউ নেই। কোনো শব্দ নেই। ভাবতে অবাক লাগছে ওর। এখানে সবসময় কমপক্ষে বারোজন ঝি-চাকর কাজ করে। রান্না করছে। কাপড় ধুচ্ছে। জানালা-দরজা-দেয়াল-মেঝে-আসবাবপত্র ধোয়া মোছা করছে। জুতো-স্যাণ্ডেল পালিশ করছে। আর এখন ও একা। আর আছে প্রতারক পুরনো স্মৃতি।

আলো না জ্বালিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো ট্রেসি। কতো পরিচিত ওর এই রুমগুলো। মনে হচ্ছে এতদিন এখানেই ছিলো ও। কখনো ওদের ছেড়ে যায়নি।

মন্থর পায়ে হলরুমে ঢুকলো ট্রেসি। সুটকেসটাকে মাঝখানে রেখে পুরনো

অভ্যাসবশে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের বেডরুমের দিকে এগোতে লাগলো। এগোতে এগোতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। হলঘরের ও পাশে বাবার বেডরুম। ঘুরে সেদিকে পা বাড়ালো ট্রেসি।

ধীরে ধীরে বাবার ঘরের দরজা খুললো। আলো জ্বাললো। সবকিছু আগের মতোই আছে। বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, ফায়ারপ্লেস···

আস্তে আস্তে জানালার পাশে দাঁড়ালো ট্রেসি। লোহার শাটারগুলো বন্ধ। পর্দা ফেলা। পর্দা তুলে শাটারগুলো খুলে দিলো ও। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো সতেজ পাহাড়ী বাতাস। মৃদু, ঠাণ্ডা। শরৎ আসছে। হঠাৎ নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো ওর। না, আমি এখান থেকে যাবো না। এ ঘরেই থাকবো।

জানালার পাশে একটা চেয়ার টেনে আনলো ট্রেসি; আলো নিবিয়ে হেলান দিলো। আহ! কী অপূর্ব বাতাস! তাজা, ঝরঝরে। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। মাথাটা আগের চেয়ে অনেক হাল্কা লাগছে। তখনি ও অনুভব করলো খিদে পেয়েছে। সেই ভালো। খেয়ে একটা লম্বা ঘুম। অতীতের কোনকিছু ভাবতে ভালো লাগছে না। কে ভাবতে পেরেছিল এতো প্রতারক হবে স্মৃতি। না, ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই।

কিচেন নিচে। ভেতরে ঢুকে খাবার খুঁজতে লাগলো ট্রেসি। রেফ্রিজেরেটর খুলে দেখে কিছুই নেই। না থাকারই কথা। ও তো কাউকে খবর দেয়নি। শেষে কাবার্ড হাতড়ে পেলো দুটো ছোট ছোট মাছের কৌটা, একটা নেসকাফের জার, এক প্যাকেট বিস্কুট।

দুদিন এখানে থাকতে হলে খাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা পরিকল্পনা খাড়া করলো ট্রেসি। প্রতিদিন শহরে যাওয়া আসা করা যাবে না। একবারে সব খরচ করে আনতে হবে। কারপোর্টে একটা জীপ সবসময় থাকে। ওটা কি এখনো ওখানে আছে? দেখে নেয়া ভালো।

কিচেনের পিছন দরজা খুলে কারপোর্টে এলো ট্রেসি। হ্যাঁ। জীপ আছে। কিচেনে ফিরে কাবার্ডের পিছনের চাবির বোর্ড থেকে জীপের চাবি নিয়ে আবার কারপোর্টে ঢুকলো ও। পেট্রোল আছে তো? চাবি ঘুরিয়ে স্টার্টার চাপলো ট্রেসি।

সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠলো মোটর। তাহলে সমস্যা নেই। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাজারে যাবে ও।

ভিলায় ফিরলো ট্রেসি। হলরুম দিয়ে যাবার সময়ে বেজে উঠলো টেলিফোন। নিশ্চয় হাসান। এখন? কি বলবে ওকে? আসতে নিষেধ করবে? ভাবতেই টলে উঠলো ওর বিবেক। কেমন করে তা পারবে ও?

কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভার তুললো ট্রেসি।

'হ্যালো।'

'ট্রেসি?'

'হ্যাঁ।' বিস্ময়ে চমকে উঠলো ট্রেসি। এ তো ডরিসের গলা। হঠাৎ ওর কি দরকার পড়লো আমার কাছে।

'আমি ডরিস বলছি। তুমি ভালো আছো? মি. মেয়ারের জন্যে খুব খারাপ লাগছে। ট্রেসি, মাই সুইট মিস্টার, ভেঙে পড়ো না। সার্ডিনা থেকে লণ্ডনে চলে এসো। কি, আসছো?'

'বলতে পারছি না। বেশ ঝামেলায় আছি। তবে আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ। রিচার্ড কেমন আছে?'

'ভালো নেই।'

'কেন?'

'তুমি নাকি শেয়ার বিক্রিতে রাজি হচ্ছো না। তুমি কি সিরিয়াস?'

'ডরিস, বিজনেস বাদ দাও। জীবনের কথা বলো।'

'নাইস। শোনো, একটা উপদেশ দিচ্ছি। বিজনেস বাদ দাও। চুলোয় যাক শেয়ার প্রব্লেম। জীবনটাকে ভোগ করো। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলো। ছেলে দেখবো?'

'ধন্যবাদ। না। বন্দোবস্ত হয়েই আছে।'

'সৌভাগ্যবানটা কে?'

'এখনো গোপনীয়।'

'ওহ্, দুষ্টু মেয়ে। আচ্ছা রাখি। গুড নাইট।'

'ডরিস, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, মনে কিছু করবে না তো?'

'ঠাট্টা করো না। মনে রেখো, আমি তোমার একটাই ভাবী। বলো।'

'হঠাৎ আমাকে টেলিফোন করলে কেন?'

'জানাটা কি খুবই জরুরি?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেসি, আমিও ইণ্ডাস্ট্রির খবর কিছু রাখি। শেয়ার বিক্রি করে দেয়াই ভালো। এখনকার ডিরেক্টররা কেউই কাজের না। ওদের সঙ্গে থেকে কোনো লাভ নেই। ওরা যখন সবাই রাজি, তুমি মাঝখান থেকে অহেতুক বাধা দিও না। তোমার হারাবার কিছু নেই। চিরকাল সবকিছু একভাবে চলে না। জীবন ইণ্ডাস্ট্রির চেয়ে অনেক সুন্দর। জীবনকেই বেছে নাও। রাখি। অনেক বকবক করলাম। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

আবোলতাবোল কথা হলেও ভালো লাগছে ট্রেসির। গত সপ্তাহটা ওর কেটেছে একটার পর একটা বিভ্রান্তিকর ঘটনায়। জীবন মনে হয়েছে যন্ত্রণাময়, বেঁচে থাকা অভিশাপ।

ডরিসের খোলামেলা কথায় জীবনটাকে আবার সহজ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো জটিলতা নেই। হঠাৎ ওর বোনদের সঙ্গে কথা বলার এক প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করলো ট্রেসি। শোনা যাক, ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ওদের কি অভিমত। কিন্তু ওদের টেলিফোন নম্বর ও জানে না। এখন?

ভাবতে ভাবতে ট্রেসির মনে পড়লো, ও এখন মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পুনার নিশ্চয় ওর সেক্রেটারীর দায়িত্ব ভোলেনি। নিশ্চয় ট্রেসির লাগেজে একটা ডায়েরী রেখেছে।

হলঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে লাইব্রেরীতে ঢুকলো ট্রেসি। টেবিলে রেখে ওটা খুলে ও দেখে, মাঝখানে একটা ব্রীফকেস। গায়ে ডেভিড মেয়ারের নাম।

তাহলে এই ব্রীফকেসের কথাই বলেছিল পুনার। বাবার শেষ মুহূর্তের সঙ্গী। স্মৃতি।

ব্রীফকেসের পাশেই দুটো চাবি। ব্রীফকেস, চাবি আর ডায়েরীটা বের করে সুটকেস বন্ধ করলো ট্রেসি। দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে বাবার শেষ স্মৃতির ভেতর কি আছে?

চাবি ঢুকিয়ে ব্রীফকেস খুললো ট্রেসি। মাঝখানে একটা বড় ম্যানিলা খাম। মুখ খোলা। ভেতরে হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে এলো টাইপকরা দুটো পৃষ্ঠা। পড়তে আরম্ভ করলো ট্রেসি।

মি. ডেভিড মেয়ার ১. ৯. ...

গোপনীয়

কোনো কপি নেই

আমরা গত তিনমাসে প্রতিটি ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তদন্ত করেছি। আপনার সন্দেহ সত্যি।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে ঘিরে এ পর্যন্ত যে সাতটি ঘটনা ঘটেছে, তার কোনটিই দুর্ঘটনা নয়। পরিকল্পিত।

চিলিতে প্লাস্টিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্লাস্টিক বোমা মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের তৈরি।

পরপর যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চ প্রজেক্টের ফর্মুলা বাইরের ফার্মগুলো ব্যবহার করেছে সেটাও আকস্মিক ব্যাপার নয়। অত্যন্ত গোপনে ফর্মুলা তৈরির গবেষণা চলেছে, তাছাড়া চারটি আলাদা ল্যাবরেটরীতে গবেষণাগুলো সংঘটিত হয়েছে। সবখানে ছিলো কড়া পাহারা। একমাত্র ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের পক্ষেই এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং

গোপনীয়তা ভেদ করা সম্ভব।

জাহাজ ভর্তি বিষাক্ত ওষুধগুলোকে যে লেবেল লাগিয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছিল আমরা সে সব লেবেল পরীক্ষা করে দেখেছি। লেবেলের রাসায়নিক উপাদান মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের এবং ছাপাও হয়েছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ছাপাখানায়।

কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও যে ল্যাবরেটরী থেকে বেশ কিছু মারাত্মক বিষ চুরি হয়েছে সেটাও ডিরেক্টর বোর্ডের কোনো সদস্যের পক্ষেই কেবল ঘটানো সম্ভব।

আমরা সবকিছু যাচাই করার পর ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছি, এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কোনো একজন ডিরেক্টর এর জন্যে দায়ী।

আমরা সেই ডিরেক্টরকে সনাক্ত করার কাজে হাত দিচ্ছি। চূড়ান্ত রিপোর্ট তিনমাস পরে দেয়া হবে।

নিচে কারো সই নেই। কিন্তু ট্রেসির বুঝতে অসুবিধে হলো না, এটা সেই গোয়েন্দা দলের রিপোর্ট যার কথা হাসান বলেছিল। মনে পড়ছে হাসানের কথা, '…ছমাস আগে গোয়েন্দা দল লাগানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের প্রাথমিক খসড়া আসার কথা। ডেভিড মেয়ার তা পেয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আমাকে কিছু জানাননি…'

কেমন করে জানাবেন? বাবা কি ভাবতে পেরেছিল, যাকে তিনি নিজ হাতে গড়ে তুলেছেন সে-ই হবে তার প্রিয় ইণ্ডাস্ট্রির সর্বনাশকারী, এবং শেষে তাঁর হত্যাকারী? বাবা কি সত্যিই সন্দেহ করেছিল হাসানকে? নিশ্চয় করেছিলেন। নাহলে কেন তিনি হাসানকে জানাননি গোয়েন্দা দলের রিপোর্টের কথা। রিপোর্টে তারিখ দেয়া আছে পয়লা সেপ্টেম্বর আর বাবা মারা গেছেন পাঁচ তারিখে। অর্থাৎ

কম করে হলেও বলার জন্যে বাবা সময় পেয়েছিলেন তিন দিন। তবু বলেননি। আর তাছাড়া হাসান বাবার সঙ্গে ছিলো মন্ট ব্লঙ্কে। সে কথা গোপন করেছে হাসান। কেন?…

কিন্তু বাবাকে গোয়েন্দা দল লাগানোর পরামর্শ তো হাসানই দিয়েছিল! এতো দুঃখেও হঠাৎ ভীষণ হাসি পেলো ট্রেসির। মনে হচ্ছে ওর জীবন একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস। ওই সব উপন্যাসের অপরাধীরা শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষ সাজার চেষ্টা করে, এবং সেভাবে সাজায় ঘটনাগুলো।

কিন্তু ও হাসানকে খুনী ভাবছে কেন? সার্ডিনা ভিলাতে ঢোকার আগেই ট্যাক্সিতে বসে ও শপথ করেছে, হাসানকে খুনী ভাববে না। না। না। না। ডিরেক্টর বোর্ডের আরো চারজন সদস্য আছে। ওদের কেউ অপরাধী। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ।

আর কোনো দ্বিধা নয়। এবার একটা লম্বা ঘুম দরকার। সবকিছু ভুলে যেতে হবে। রিপোর্ট আর ডায়েরী নিয়ে ডেভিড মেয়ারের বেডরুমে ঢুকলো ট্রেসি। জানালার পাশে ওর টেনে আনা চেয়ারটাতে ওগুলোকে রেখে বাবার বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম আসার আগে আবার ডুবে গেল হাসানের চিন্তায়। এখানে আসার প্রায় ছ ঘন্টার মতো হবে। হাসান জানে সেকথা। তাহলে ও এখনো টেলিফোন করছে না কেন? হামবুর্গে কোনো ঝামেলা? খচখচ করছে প্রেমিক মন।

বিছানা ছেড়ে চেয়ার থেকে ডায়েরী তুলে উনিশ তারিখের পাতা ওল্টালো ট্রেসি। পুনার লিখেছে ঃ মি. হাসান হামবুর্গে…টেলিফোন নম্বর …৩/৯৮৭৩৮২…মিস মেয়ার সার্ডিনায়…

হামবুর্গে ডায়াল ঘোরালো ট্রেসি।

'হ্যালো।'

'হ্যালো।'

'কে বলছেন?'

'মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের হামবুর্গ শাখার সেলস ম্যানেজার ব্যোল বলছি। আপনি কে?'

'মিস মেয়ার। মেয়ার…'

'কনগ্রাচুলেশান, মিস মেয়ার। বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'মি. হাসান জহির কোথায়?'

'ঘন্টা দুয়েক আগে ইটালীর পথে যাত্রা করেছেন।'

'হামবুর্গের ঝামেলা মিটেছে?'

'হ্যাঁ। মি. হাসান হাত দিলে ঝড়ের গতিতে মিটে যায় সমস্যা। আমরা ভেবেছিলাম কমপক্ষে দুদিন লাগবে। অথচ…'

'ধন্যবাদ, মি. ব্যোল।'

'গুড নাইট, মিস মেয়ার।'

'গুড নাইট।'

তাহলে হাসান রওনা হয়েছে। হাসান আমার হাসান। সার্ডিনায় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে? খুব বেশি হলে আর দুঘন্টা। তাহলে আর ঘুম নয়। জেগেই কাটাবো।

বিছানায় শুয়ে ওর একুশতম জন্মবার্ষিকীর মধুর স্মৃতি নিয়ে খেলা করতে লাগলো টেসি। কিন্তু ভীষণ ক্লান্ত ও। স্মৃতি নিয়ে খেলা করতে করতে নিজের চোখের বিরুদ্ধে ঘুমিয়ে পড়লো।

আট

ভোরে আরম্ভ হলো বৃষ্টি।

ঘুম ভেঙে ট্রেসি দেখে, ভিজে যাচ্ছে সবকিছু। তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সাতটা বাজে। খিদেয় পেট মোচড় দিচ্ছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল ওর। কোথায় ঘুমোবে তা না, যাও এখন খাবার আনতে।

বাথরুমে ঢুকে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে ড্রেস পাল্টাতে লাগলো ও। নাইটি ছেড়ে পরলো জিনসের ট্রাউজার, সোয়েটার, রেইন কোট।

কারপোর্ট থেকে জীপ বের করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো ট্রেসি। গাড়ি উঠে এলো সরু পাহাড়ী রাস্তায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু রাস্তা ভেজা। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলো ট্রেসি।

এ সময় রাস্তায় মানুষজন নেই। প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাতি জ্বলছে বাড়িঘরগুলোয়। অপূর্ব দৃশ্য। রোমান্টিক হয়ে উঠলো ও।

বাঁপাশে তাকিয়ে দেখে, নিচে সমুদ্র। আধারে ঢাকা। ঢেউগুলো বিক্ষুব্ধ, ফুলে ফুলে উঠছে। কি ব্যাপার? ঝড় আসবে নাকি? সার্ডিনায় এ সময় মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় হয়।

ডানদিকে পাহাড়ী দেয়াল। কয়েক হাত পরে একটা বাঁক। ঢালটা ক্রমশ

খাড়া হয়ে উঠছে। জীপের গতি কমাবার জন্যে ব্রেকের ওপর পা রাখলো ট্রেসি। কিন্তু একি, অনড় হয়ে আছে ব্রেক। নড়ছে না।

ব্রেক নষ্ট!

তার মানে? ঘাবড়ে গেছে ট্রেসি।

আরো জোরে, বারবার ব্রেক চাপতে লাগলো ও। এক সময় হাঁপাতে আরম্ভ করলো। শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রেক কাজ করছে না।

বাড়ছে জীপের গতি।

দ্রুত বাঁক পেরিয়ে চড়াইয়ের পথ ধরলো জীপ। গতি বাড়ছে। বাড়ছেই প্রতি সেকেণ্ডে। ব্রেক চেপে যাচ্ছে ট্রেসি। কিন্তু ব্রেক পাহাড়ের মতো অনড়।

সামনে আর একটা বাঁক। এখন?

রাস্তা থেকে চোখ সরাতে পাচ্ছে না ট্রেসি। অথচ গতি জানা দরকার। রাস্তার ওপর দৃষ্টি রেখে চোখের এক কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখে ঝড়ের মতো উঠে আসছে কাঁটা। ষাট ছুঁই ছুঁই করছে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ড দিয়ে।

বাঁকে পৌঁছে গেছে জীপ।

ট্রেসি কিছু বোঝার আগেই ভয়ংকর গতিতে নামলো সামনের চাকা। খাড়াইয়ের মাথায় ঘষা খেলো পিছনের চাকার টায়ার। তবু থামলো না জীপ। উতরাই ধরে হাওয়ার গতিতে নামতে থাকলো।

কোনকিছু দিয়েই আর থামানো যাবে না জীপ। কোনো বাধা নেই। কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সামনে শুধু একটার পর একটা বিপদজনক বাঁক।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ট্রেসি। মন বাঁচতে চাইছে। সত্যিই কি মরতে চলেছে ও? এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝাপ দেয়ার কথা ভাবলো ও। ঝুঁকি নিয়ে আবার তাকালো স্পীডোমিটারের দিকে। সত্তরের ঘর ছুঁয়েছে কাঁটা। প্রতি মুহূর্তে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

এক পাশে পাহাড়ের দেয়াল। আর এক পাশে খাদ, শূন্যতা। আর এ দুয়ের মাঝখানে গতির ভেতর মারা যাচ্ছে ও।

অবাক হয়ে ভাবছে ট্রেসি। মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই গতিতে ঝাঁপ দেয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু পালাতে চাইছে মন।

ওকে খুন করা হচ্ছে। সেটা বুঝে গেছে ও। এবং ওর প্রেমিকই ওকে খুন করছে। সার্ডিনা ভিলায় একমাত্র হাসানেরই আসার কথা। নিশ্চয় রাতে পৌঁছেছে। হামবুর্গ থেকে সার্ডিনা আসতে কতক্ষণ লাগবে? খুব বেশি হলে চার-পাঁচ ঘন্টা। অথচ হাসান এখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি। খিদের কারণে কথাটা আগে মনে পড়েনি। কিন্তু সে কথা ভেবে এখন কি লাভ? মৃত্যু হচ্ছে আমার! হায় ভালোবাসা!

আমার প্রেমিক সত্যিই বুদ্ধিমান। ভেবে অবাক না হয়ে পারলো না ট্রেসি। কতো সুনিপুণভাবে সাজিয়েছে দৃশ্যটা। আমার মৃত্যু মনে হবে একটা দুর্ঘটনা। যেমন মনে হয়েছে বাবারটা।

কান্না বেরিয়ে এলো ট্রেসির চোখ দিয়ে। ইতিমধ্যে আবার বৃষ্টি নেমেছে।

পাথরের ভেজা গা থেকে আস্তে আস্তে আলগা হয়ে আসতে লাগলো জীপের চাকা। ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। চাকাগুলোকে রাস্তার ওপর ধরে রাখার জন্যে প্রাণপণে স্টিয়ারিং-এর নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করার চেষ্টা করছে ট্রেসি।

এই তো আর কয়েক সেকেণ্ড। তারপর আমার মৃত্যু হবে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে খাদে পড়বো। তলাবিহীন খাদে। যেমন হারিয়ে গেছে বাবা হিমবাহের ফাটলে।

শক্ত হয়ে উঠলো ট্রেসির শরীর। স্টিয়ারিং হুইলে অবশ হয়ে আসছে হাতের আঙুলগুলো।

পাথরের গা থেকে আলগা হয়ে গেছে চাকা। স্টিয়ারিং ধরে রাখতে হাত ভেঙে যাবার অবস্থা হলো ট্রেসির। তাকিয়ে দেখে ঘন্টায় আশি মাইল বেগে ছুটছে

জীপ।

সামনে আর একটা বাঁক। বিপজ্জনক। ঢালটা হেয়ার পিনের মতো খাড়া। এটা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। না। ওখানেই ওত পেতে আছে আমার মরণ।

বরফের মতো জমে গেল ট্রেসির হৃৎপিণ্ড। বাস্তব আর স্বপ্ন এক হয়ে গেল ওর। শুনতে পাচ্ছে বাবা ডাকছে, 'ট্রেসি, অন্ধকারে বসে কি করছো।' তারপর বাবা ওকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। হাসান বলছে, 'একজন সুন্দরী রমণীর শ্রেষ্ঠতম জন্মদিনের জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে কোনো রেস্তোরাঁ নেই।' ওকে কোলে নিলো হাসান। ও বলছে, 'হাসান, আমি তোমার। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।' ডায়েরীতে লিখলো, 'মিসেস হাসান জহির।'

চিৎকার করে উঠলো ট্রেসি। হুহু করে রক্ত ঢুকলো হৃৎপিণ্ডের ভেতর। চেতনা ফিরে এলো ওর। কিন্তু দৃশ্যটা আগের মতোই ঝুলে আছে। হেয়ারপিনের মতো খাড়া ঢাল। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জীপ সেদিকে ছুটে যাচ্ছে বুলেটের মতো।

এমন সময় ট্রেসির দৃষ্টি আটকা পড়লো হাতের ডানে, পাহাড়ী দেয়ালে। একটা ট্রেইল। ওপরে উঠে গেছে।

মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলো ট্রেসি। ডানে ঘোড়ালো স্টীয়ারিং। ট্রেইলে ঢুকলো জীপ। কিছুদূর উঠতেই আরম্ভ হলো গাছের সারি। চোখেমুখে ঝাপটা লাগছে পাতার, ডালের।

ট্রেইল কোথায় গেছে জানে না ও। শুধু দেখতে পাচ্ছে, ওপরে উঠছে সেটা। এটাই এখন ওর জন্যে একমাত্র সান্ত্বনা। উঠতে উঠতে যদি কমে যায় গাড়ির গতি?

হঠাৎ নিচে নামতে শুরু করলো জীপ। ব্যাপারটা বোঝার আগেই দেখে, সামনে সমুদ্র। তাহলে মৃত্যুর হাত থেকে পালাতে গিয়ে তার হাতেই ধরা পড়লাম! তবু ভালো, সমুদ্রে মরছি আমি। কিন্তু হাসান, আমি মরতে চেয়েছিলাম

তোমার আলিঙ্গনে…

জীপ নামছে। নামছে। কাছে আসছে সমুদ্র। মাত্র কয়েক শত ফুট দূরে।…

একটা গাছের ডাল জোরে ঝাপটা মারলো ট্রেসির জীপে।

রাস্তা থেকে আলগা হয়ে গেল সামনের চাকা।

ঘষা খেয়ে পিছলে গেল পিছনের চাকা।

উল্টে পড়ে যাচ্ছে জীপ…

চিৎকার করে উঠলো ট্রেসিঃ হাসান একি করলে তুমি, মারলেই যখন তোমার বুকে নিয়ে মারলে না কেন…

পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো সে মরণ-চিৎকার।

নয়

হাসপাতালে চোখ খুললো ট্রেসি।

চোখাচোখি হলো হাসানের সঙ্গে।

'হাসান?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বেঁচে আছি?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন হলো?'

'বাহাত্তর ঘন্টা।'

'তুমি কবে এসেছো?'

'ঘটনার দিন। আচ্ছা, ট্রেসি, বলো তো তুমি রাস্তা ছেড়ে ট্রেইলে উঠেছিলে কেন?'

'খাবার আনতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি ব্রেক কাজ করছে না। ঘন্টায় নব্বই মাইল বেগে ছুটতে লাগলো জীপ। আমি মরিয়া হয়ে…'

'তোমার জ্ঞান ছিলো না। ডাক্তাররা বলেছে, তোমার বেঁচে থাকা অলৌকিক ব্যাপার। যারা ঘটনাটা দেখেছে, তাদের মতে, তোমার মরে যাবার কথা। তুমি মাথায় চোট খেয়েছো, অনেক জায়গা কেটে ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু কপাল তোমার, হাড় ভাঙেনি। এমন দুর্ঘটনা…'

'হাসান, এটা দুর্ঘটনা নয়…'

'মানে?'

'আমাকে খুন করা হচ্ছিল।'

'খুন! কে?'

'যে আমার বাবাকে খুন করেছে।'

'তাহলে আমাদের সন্দেহ সত্যি?'

'হ্যাঁ। এবং খুনীকে দেখা গেছে।'

'খুনীকে দেখা গেছে?'

'এখনো চেনা যায়নি, তবে ডিরেক্টরদের কোনো একজন।'

'কে বলেছে?'

'হোটেলের রিসেপশনিস্ট। সে বলেছে, এক ভদ্রলোক ডেভিড মেয়ারের সঙ্গে হোটেলে উঠেছিলেন। পরে চলে যান।'

'নাম বলেনি?'

'না। তবে চেহারা তোমার মতো।'

'হ্যাঁ। আমিই তো ছিলাম।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ।'

'আগে বলোনি যে?'

'এখনো বলতে চাই না। সেটা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। সে রাতের কথা আমি ভুলে যেতে চাই।'

'হাসান, কি বলছো?'

'হ্যাঁ। মন্ট ব্লঙ্কে আমি ছিলাম।...'

'হাসান, থামো। আমি শুনতে চাই না।'

'না। শোনো। সেদিন তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছেন। কিছু লুকিয়েছেন আমার কাছ থেকে। আমি অভিমানে ইস্তাম্বুল চলে যাই।'

'কেমন করে বুঝলে বাবা কিছু লুকিয়েছেন?'

'তোমার কাছ থেকে ফিরে আমি হল্যাণ্ডে নামতে না নামতেই জরুরী তলব পাঠালেন তোমার বাবা। বললেন, অনেক কথা আছে। অথচ মন্ট ব্লঙ্কে বললেন, হাসান, তোমাকে না ডাকলেই ভালো করতাম। তুমি কোথাও বেড়াতে যাও।'

আমি জানি, বাবার অমন আচরণের কারণ। নিশ্চয় বাবা আগে গোয়েন্দা দলের রিপোর্ট পড়েননি। পড়েছেন মন্ট ব্লঙ্কে। তারপর, তাঁর পক্ষে কাউকে বিশ্বাস করা খুবই কষ্টকর।

ট্রেসিকে চুপ থাকতে দেখে হাসান বললো, 'ট্রেসি, তুমি চুপ করে আছো কেন?'

'ভাবছি, বাবাকে কে খুন করতে পারে; তারপর আমাকে। আচ্ছা, হাসান, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি।'

ট্রেসি, দুর্ঘটনার সব স্মৃতি তোমার মনে আছে? বলো তো।'

'ব্রেক কাজ করছিল না। অথচ আগের রাতে জীপ পরীক্ষা করেছি আমি। সব ঠিক ছিলো।'

কখন পরীক্ষা করেছিলে?'

'রাত দশটায়।'

'ভিলা থেকে বেরিয়েছো কখন?'

'সকাল সাড়ে সাতটায়।'

'তাহলে এ সময়ের মধ্যে কেউ এসেছিল।'

কে হতে পারে? তুমি কখন এসেছো?'

'দুপুর বারোটায়।'

'বারোটায়! এতক্ষণ লাগলো?'

'প্লেনে আসিনি। মনে হলো তোমাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আসি। ইটালীর ট্রেন ধরলাম। ভেনিসে সারারাত গণ্ডোলায় ঘুরেছি। কী অপূর্ব শহর! ট্রেসি, আমরা ভেনিসে হানিমুন করবো।...কিন্তু ভাবছি, কে আসতে পারে?...

'ভাদিম, কার্লো, বাওয়ার, রিচার্ড...না, কাউকে খুনী মনে হয় না, যদিও ওদের সবার এ মুহূর্তে অনেক টাকা দরকার...'

'অনেক টাকা দরকার?'

'হ্যাঁ। শুনবে ওদের ইতিহাস? অত্যন্ত জঘন্য।'

'বলো। কিন্তু জানলে কেমন করে?'

'আমাদের সিকিউরিটি বিভাগে ওদের বায়োডাটা আছে। অত্যন্ত গোপনীয়।'

'তাহলে জানলে কিভাবে?'

'মি. মেয়ার বলেছেন। এ ছাড়া আমি কম্পিউটারের পাঁচটা ভাষা জানি। সেগুলো কাজে লাগিয়েছি। উপরন্তু ওদের সঙ্গে গত বছর থেকে ঘনিষ্ঠভাবে

মিশছি। অনেক সময় লেগেছে। তবে আমার মনে হয়, মাত্র পঞ্চাশ ভাগ জানতে পেরেছি। যাক। শোনো।

'কার্লোকে দিয়েই শুরু করি। তুমি জানো, ও একজন স্থপতি। খুব মেধাবী শিল্পী ছিলো কার্লো। নাম-ডাকও ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। কিন্তু একটা বাজে স্বভাব ছিলো ওর। অবশ্য এজন্যে ওর চেহারাই দায়ী। তুমিও দেখেছো, মেয়ে-পটানো চেহারা ওর। কয়েক ডজন বান্ধবী ছিলো কার্লোর। মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতো, কে বিয়ে করবে ওকে।

'সবাইকে হতাশ করে কার্লো বিয়ে করে তোমার বোন সোফিয়াকে। সোফিয়ার সৌন্দর্য নিয়ে কারো সন্দেহ নেই। তবে ওকে বিয়ে করার পিছনে সম্পদের লোভও কাজ করেছে। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের শেয়ারের দাম কয়েকশো মিলিয়ন ডলার।

'বিয়ের পর স্বভাব কিছুটা পাল্টায় কার্লোর। খুব গোপনে মেলামেশা করতো ওর বান্ধবীদের সঙ্গে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। প্রেমের ফাঁদে আর একবার পা দেয় ও।

'সিসিলির মেয়ে এমিলিয়ার প্রেমে পড়ে কার্লো। ভূমধ্যসাগরের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মেছিল এমিলিয়া। কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারেনি।

'এমিলিয়াকে রোমে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় কার্লো। এমিলিয়ার নামে একটা বাসা ভাড়া করে। এমিলিয়ার গর্ভে একে একে তিনটি পুত্র-সন্তান জন্মায় কার্লোর। ওদিকে সোফিয়ার গর্ভে তিন কন্যা।

'বাড়তি খরচ বহন করতে হলেও ভালোই চলছিল কার্লোর জীবন। কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় ওর ছেলেদের কাছে। "রোমা ফিনানসিয়ালে" ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল কার্লোর সংক্ষিপ্ত জীবনী। সঙ্গে বৌ এবং কন্যাদের ছবি।

'বাবাকে অন্য নারী এবং তিন কন্যার সঙ্গে দেখে মাকে নানা কথা বলতে

শারণ করলো ওর কিশোর তিন পুত্র। ওদেরকে তখনকার মতো কোনরকমে সামাল দিলেও এমিলিয়া বুঝলো, ছেলেরা বড় হচ্ছে, এখনি সাবধান হতে হবে।

'সমস্যাটা কার্লোকে জানায় এমিলিয়া। সমাধান খোঁজার দায়িত্ব কার্লো ওর ওপরই ছেড়ে দিলো। অনেক ভেবেচিন্তে এমিলিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো, ইটালীতে থাকা যাবে না, অন্য কোনো দেশে বাসা বাঁধতে হবে। হিসেব করে দেখা গেল খরচের পরিমাণ পঞ্চাশ লাখ ডলার। এতো টাকা একসঙ্গে কার্লো কেমন করে দেবে? ...

'এবার শোনো তোমার ফরাসী বোন লিজির কথা। একটা জ্বলজ্যান্ত বাঘিনী ও। ওর দেহের খিদে কখনোই মিটবে না। একটার পর একটা বিয়ে করেছে আর ছেড়েছে।

'ভাদিম একটা কাপুরুষ। ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ। তৃতীয় শ্রেণীর উকিল ছিলো। এক ডিভোর্স মামলায় ওর সঙ্গে পরিচয় লিজির।

'রতনে রতন চেনে। ভাদিমকে দেখে লিজির সন্দেহ থাকলো না, এমন কাপুরুষ ব্যক্তিত্বহীন পুরুষই চাই স্বামী হিসেবে। চিরকাল ওকে হাতের মুঠোয় রাখা যাবে।

'ভাদিম নামে মাত্র মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের পরিচালক। টাকা পয়সা সব লিজির হাতে। ভাদিমকে একটা মাসোহারা দেয় মাত্র।

'বিয়ের পর নিজের ভুল বুঝতে পারে ভাদিম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। লিজিকে ডিভোর্স করার সাহস ওর নেই। শেষে ও সিদ্ধান্ত নিলো লিজির কিছু টাকা সরিয়ে পালাবে ও। কিন্তু কিভাবে?

'লিজির অলংকারের শেষ নেই। অত্যন্ত মূল্যবান ওই সব অলংকার। বিছানার পাশের দেয়ালে ওগুলো রাখে লিজি। খোলার কম্বিনেশন জানে ভাদিম।

'সুযোগ কাজে লাগালো ভাদিম। লিজি বাসায় না থাকলে একটা করে

অলংকার সরায় ও। বিক্রি করে ওটার ডুপ্লিকেট রাখে দেয়াল আলমারিতে। এভাবে প্রায় ত্রিশ লাখ ডলারের অলংকার সরায় ভাদিম। সেগুলো রাখলো ওর এক বন্ধুর কাছে।

'কিন্তু একদিন সন্দেহ হলো লিজির। একটা নেকলেস পরতে গিয়ে মনে হলো নকল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকলো ওর জুয়েলারকে। জুয়েলার দেখে বললো, ওর অনুমান ঠিক।

'জুয়েলারকে বিদায় করে ভাদিমকে শোবার ঘরে ডাকলো লিজি। দেয়ালের কম্বিনেশন ও ছাড়া একমাত্র ভাদিম জানে।

'ঘরে ঢোকার সময় দরজায় কাপড় ভিজিয়ে ফেলে ভাদিম। হ্যাঁ। এরকমই স্বামী প্রয়োজন লিজির। ভাদিমকে কিছু বললো না ও। শুধু অলংকারগুলো ফেরত আনতে বললো।

'জীবন হাতে পেয়ে টাকা আনতে বন্ধুর কাছে ছুটলো ভাদিম। কিন্তু বন্ধু তখন হাওয়া।

'বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলো ভাদিম। লিজি সব শুনে বললো, ঠিক আছে, তোমাকে মাফ করতে পারি এক শর্তে। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের শেয়ার বিক্রি করতে হবে।

'কেন? লিজি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। ও নিজেই কিছু করতে চায়। শেয়ারের টাকা পেলে ও নিজেই ইণ্ডাষ্ট্রি খুলবে।...

'মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে রিচার্ড হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং ভদ্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও।

'ওর সঙ্গে ডরিসের প্রেম একটা দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা বললে ভুল হবে, একে বলে সর্বনাশ। পেশায় ডরিস ছিলো কল-গার্ল। একটা নাইট ক্লাবে নাচতো।

'পরিচয়ের প্রথম রাতেই রিচার্ডকে বিছানায় চরম আনন্দ দেয় ডরিস।

রিচার্ড হচ্ছে শীতল পুরুষ। মিলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে ও। ডরিসের শরীরে প্রথম চরম আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করে সে।

'ফলে আস্তে আস্তে ডরিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে রিচার্ড। সুযোগটা কাজে লাগায় ডরিস। অত্যন্ত লোভী মেয়ে ও।

'বিয়ের পর বদলে যায় ডরিস। বিছানায় রিচার্ডকে আর সাহায্য করে না। ধীরে ধীরে রিচার্ডের ভেতরে দানা বাঁধতে থাকে পুরনো নপুংসকতাবোধ।

'এদিকে ডরিস আরম্ভ করে উদ্দামজীবন। বাড়তে থাকে পুরুষ বন্ধুর সংখ্যা। জুয়া, রেস। কাপড়চোপড়। অলংকার।...

'ডরিসের ওইসব বিল মেটাতে হয় রিচার্ডকে। এক সময় বিলের পরিমাণ ওর চলতি আয় ছাড়িয়ে যায়।

'ধার করতে আরম্ভ করে রিচার্ড। তার পরিমাণ পঞ্চাশ লাখে পৌঁছেছে ছয় মাস আগে। টাকা ফেরত দেবার জন্যে চাপ দিতে থাকে পাওনাদাররা।

'কিভাবে এতো টাকা একসঙ্গে শোধ করবে রিচার্ড?...

'কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে বাওয়ার। তোমার বোন স্টেফি একটা ছিটগ্রস্ত মেয়ে। বাওয়ারের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছে।

'স্টেফি যখন সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা, একদিন বাথরুমে পড়ে যায় ও। শুরু হয় রক্তপাত। ক্লিনিকে দুমাস থাকতে হয় ওকে।

'একটা ছেলের জন্ম দিয়েছিলো স্টেফি। কিন্তু বাচ্চা জন্মের পর মারা যায়। স্টেফি সে কথা বিশ্বাস করেনি। ওর সন্দেহ, বাওয়ার ওর ছেলেকে অন্য কোথাও সরিয়েছে।

'সন্দেহ বাড়তে থাকে স্টেফির। পাগলামিও। ...ডাক্তার।...মেন্টাল হসপিটাল। কিছুই হয়নি। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে ওঠে স্টেফি।

'পরপর কয়েকদিন বাওয়ারকে খুন করার চেষ্টা করে। ওকে সামলানো

অসম্ভব হয়ে পড়ে। ডাক্তারের কথামতো স্টেফির কাছে স্বীকার করে বাওয়ার ছেলেকে ও সরিয়েছে। স্টেফি ওকে ছেলে আনতে বলে।

'এক ছেলেকে দত্তক আনে বাওয়ার। ছেলের বাবা-মা-র সঙ্গে দশ লাখ ডলারের চুক্তি হয়েছিল। টাকা পাওয়ার পর, তারা আরো বিশ লাখ চায়। না দিলে স্টেফিকে জানাবে ছেলের পরিচয়। এখন এতো টাকা কোথায় পাবে বাওয়ার? ওর চলতি আয় পনেরো লাখ ডলার।'

হাসানের কথা শুনে ট্রেসির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'মাই গড!'

'হ্যাঁ। ওদের সমস্যাগুলো মারাত্মক। কিন্তু খুন...'

'তোমার এখনো সন্দেহ আছে?'

'হ্যাঁ। কেননা মন্ট ব্লঙ্কে আমি ছিলাম। অতএব সেটা দুর্ঘটনাও হতে পারে। তোমার-টা এখনো পরীক্ষিত হয়নি। তোমার জীপটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আমি পুলিস স্টেশনে যাই।'

'আমিও যাবো।'

'তুমি কেমন করে যাবে? ডাক্তার তোমাকে দুমাসের বিশ্রাম নিতে বলেছে। নো টেনসন। নো মুভমেন্ট।'

'না, আমি যাবো। আমার কিছু হয়নি। ব্যথা নেই। কিছু ভাঙেনি। রেস্ট নেবো। কিন্তু এখন আমাকে নিজের চোখে ব্রেকটা দেখতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছো।'

'জানি না, ব্যবস্থা করতে পারবো কিনা। ডাক্তারের অনুমতি লাগবে। পুলিসের ব্যাপারটাও শুনতে হবে আগে। ঠিক আছে, তুমি থাকো, আমি ফোন করছি।'

'প্রোন্তো। সার্ডিনা পুলিস। চীফ জিয়াভান্নি বলছি।'

'আমি হাসান জহির। আপনি তো মিস মেয়ারের দুর্ঘটনার কথা জানেন। কিন্তু এখন একটা তদন্তের কাজে আপনাকে নামতে হবে।'

'তদন্ত! কিসের তদন্ত?'

'মিস মেয়ার বলছেন ওটা দুর্ঘটনা নয়। গাড়িতে ওঠার আগে উনি সবকিছু পরীক্ষা করেছেন, ব্রেক ঠিক ছিলো।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমি একজন ঝানু মেকানিককে ডাকছি। জীপ এখন আমাদের গ্যারেজে আছে। তাড়াতাড়ি চলে আসুন। মিস মেয়ারও আসবেন?'

'হ্যাঁ।'

'সাবধানে আনবেন। সিনোরিনার এখন বিশ্রাম দরকার।'

'হ্যাঁ। ডাক্তারের অনুমতি এখনো পাইনি।'

'বুনজরনো, সিনর।'

'বুনজরনো।'

দশ

সার্ডিনা পুলিস গ্যারেজ।

পুলিস চীফ আলবার্তো জিয়াভান্নি সবসময় অস্থিরতায় ভোগেন। কোথাও এক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। পায়চারি করেন। আশে পাশে মানুষ থাকলে তাদের সঙ্গে বকবক করেন। আর কেউ না থাকলে নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি।

মধ্যবয়সে পৌঁছেছেন জিয়াভান্নি। রোদে পোড়া গায়ের রঙ। ম্যাকরনি খাওয়া বিশাল ভুঁড়ি। বসে থাকলেও পা দুটো অনবরত নাচতে থাকে।

জিয়াভান্নির সঙ্গে এসেছে তরুণ ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তা। এই বয়সেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। পেশীবহুল সুঠাম শরীর। চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে এসেছে ট্রেসি, হাসান। অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচারে করে গ্যারেজের ভেতর একটা ট্রলির ওপর শোয়ানো হয়েছে ট্রেসিকে।

জীপ পরীক্ষা করছে একজন মেক্যানিক।

গাড়িটাকে চেনা যাচ্ছে না। দুমড়েমুচড়ে তো গেছেই, সে সঙ্গে বদলে গেছে

রঙ। গাছ এবং পাতার রস মেখে সবুজ হয়ে আছে। সামনের বাঁ দিকের ফেণ্ডার আর রেডিয়েটর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

জীপের ওই চেহারা দেখে ফুঁপিয়ে উঠলো ট্রেসি। বেশ নার্ভাস লাগছে। কেমন করে গাড়িটার মধ্যে বেঁচে ছিল ও?

ট্রেসির চেহারা দেখে ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে হাসান বললো, 'ট্রেসি, তোমার খারাপ লাগছে? এতক্ষণ এখানে থাকতে পারবে?'

'না। হ্যাঁ।' মিথ্যা কথা বললো ট্রেসি। একসঙ্গে দুর্বলতা আর ক্লান্তির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে ওকে। কিন্তু এখান থেকে যাওয়া যাবে না। নিজের চোখে সব দেখতে হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের পার্থক্য মুছে গেছে ওর জীবনে।

তেলকালি মাখা একটুকরো নোংরা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে মেক্যানিক ওদের সামনে এসে মন্তব্য করলো, 'এ রকম গাড়ি কোম্পানী আর বানায় না।'

কেউ কোনো কথা বললো না।

'অন্য কোন গাড়ি হলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো।' আবার মন্তব্য করলো মেক্যানিক।

'ব্রেকের অবস্থা কি?' জানতে চাইলো হাসান।

'ব্রেক? একদম নিখুঁত অবস্থায় আছে।'

ট্রেসির চোখের সামনে পৃথিবীটা হলদে হয়ে গেল। একি শুনছে ও? 'সিনর, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

'ব্রেক নিখুঁতভাবে কাজ করছে। দুর্ঘটনা ওটার গায়ে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি। আমি সেজন্যেই প্রথমে বলেছি, এ রকম গাড়ি কোম্পানী আর বানায় না।'

'না, এ অসম্ভব,' প্রায় চিৎকার করে উঠলো ট্রেসি, 'সেদিন ঘটনার সময় ব্রেক কাজ করছিল না।'

মেক্যানিকের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন জিয়াভান্নি, 'সিনর, কথা এতো

জটিল করে বলো না। সিনরিনা কি বলছেন, তা বুঝতে পারছো? উনি বিশ্বাস করেন, ব্রেকে কেউ কারচুপি করেছিল।'

'না, স্যার, এ হতেই পারে না,' জীপের দিকে ফিরে যেতে যেতে মাথা নেড়ে বললো ঝানু মেক্যানিক। 'আমার জানামতে দুভাবে জীপের ব্রেক অকেজো করা যায়,' ব্রেকে হাত রেখে বললো ও, 'ব্রেক লিংক কেটে দিয়ে, আর নয়তো এই বল্টুটা ঢিলা করে দিয়ে। তাহলে বেরিয়ে যাবে ব্রেক ফ্লুইড। স্যার, আপনিই দেখুন, লিংকে কোন কাটার চিহ্ন নেই। আমি ব্রেক ড্রামও পরীক্ষা করেছি। সম্পূর্ণ ভর্তি।'

ব্রেক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে ট্রেসির পাশে এসে জিয়াভান্নি আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'মিস ট্রেসি, আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছি। ওই অবস্থায়...'

'এক মিনিট, প্লীজ,' পুলিস চীফকে বাধা দিয়ে মেক্যানিককে প্রশ্ন করলো হাসান, 'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, লিংকগুলোকে আগে কেটে পরে আবার জোড়া লাগানো হয়েছে কিংবা কেউ ব্রেক ফ্লুইড সরিয়ে পরে ফের ড্রাম ভর্তি করেছে?'

'হতে পারে, সিনর। কিন্তু আমি লিংক ভালভাবে পরীক্ষা করেছি। কেউ ওখানে হাত দেয়নি। আর ফ্লুইডের ব্যাপারটা আবার দেখাচ্ছি, দেখুন।'

একটা নেকড়া দিয়ে বল্টুর চারপাশের তেল মুছে দিলো মেক্যানিক। 'বল্টুটা দেখতে পাচ্ছেন? কেউ ওটা ঢিলে করে রাখলে ওর গায়ে রেনচের দাগ থাকতো। আমার বিশ্বাস গত ছয় মাসে ওটা কেউ ছোঁয়নি।'

আস্তে আস্তে একটা আতঙ্কের স্রোত পা থেকে মাথায় উঠে আসছে ট্রেসির। তাহলে সেদিন সকালে পাহাড়ী রাস্তায় ব্রেক কাজ করছিল না কেন? ওকি মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে? চোখ বন্ধ করে ফেললো ট্রেসি।

হাসান ওর মাথায় হাত রেখে আলতো করে ডাকলো, 'ট্রেসি।'

'হাসান, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু সেদিন ব্রেক সত্যিই কাজ করেনি।'

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হাসান মেক্যানিকের কাছে জানতে চাইলো, 'ব্রেকে ঘাপলা করার আর কোনো রাস্তা আছে?'

মুখ খুললো পাওলো। 'ব্রেক লিংক ভিজে গেলে অমন হতে পারে।'

'হ্যাঁ, সিনর পাওলোর ধারণা সত্যি। কিন্তু কথা হচ্ছে, সিনরিনা,' ট্রেসির দিকে মুখ ফিরিয়ে মেক্যানিক জানতে চাইলো, 'আপনি যখন গাড়ি চালাতে আরম্ভ করেন তখন কি ব্রেক কাজ করছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এই তো আপনার উত্তর পাওয়া গেছে। পরে বৃষ্টিতে আপনার ব্রেক ভিজে যায়।'

তাহলে এটা দুর্ঘটনা!

হাসানের দিকে তাকালো ট্রেসি। চেহারায় কোনো বিকার নেই। দুর্ঘটনা জেনে ও কি সন্তুষ্ট? বাবার মৃত্যুও ও দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চায়। কিন্তু কেমন করে এটাকে দুর্ঘটনা বলে মেনে নেবে ট্রেসি! হাসানের প্রতি আবার অভিমানে ভরে উঠছে ওর মন। আর অবিশ্বাস।...

জিয়াভান্নি ট্রেসির পাশে এসে কৈফিয়ত দেয়ার মতো করে বললো, 'বৃষ্টি খুবই বিপজ্জনক, মিস মেয়ার। বিশেষ করে এইসব পাহাড়ী রাস্তায়। এমন দুর্ঘটনা অহরহ হচ্ছে।'

এক দৃষ্টিতে ট্রেসিকে দেখছে হাসান। যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে। নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে ট্রেসির। তাহলে এটা দুর্ঘটনাই। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করছে না ওর। 'সিনর, জিয়াভান্নি,' বিড়বিড় করে বললো ও, 'আমি দুঃখিত। আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম।'

'না, না, কি বলছেন আপনি। এটা আমার আনন্দ। এমন ঘটনায় কেউই

মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না। আমি আপনার কোনো উপকারে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। যাক্, ভিলায় ফিরে বিশ্রাম নিন। পাওলো আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

ভিলায় পৌঁছে ট্রেসি বললো, 'হাসান, আমাকে বাবার শোবার ঘরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করো। আমি আগামী দুমাস ওখানেই বিশ্রাম নিতে চাই।'

জ্ঞান ফেরার পর থেকেই ট্রেসি শুধু ভাবছে, গোয়েন্দা দলের ওই গোপন রিপোর্টটার কথা। ওটা আছে তো? ওটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখার কথা কেন যে আগে মনে পড়েনি?

না। রিপোর্ট নেই। বিছানায় শুয়ে চারদিকে তাকিয়ে ট্রেসি দেখে কোথাও সেই রিপোর্ট নেই। এটাও কি দুর্ঘটনা! দরজা জানালা সবই তো বন্ধ ছিলো! কিন্তু সে কথা কাকে বলবে ও? বিশ্বাস অবিশ্বাস একাকার হয়ে যাচ্ছে ওর।

ওর কল্পনা ভেঙে গেল হাসানের ডাকে।

'ট্রেসি, মাই সুইট হার্ট। কি ভাবছো?'

'কিছু না, হাসান। সত্যি, অহেতুক কী ভয় পেয়েছিলাম!'

'শোনো, এখন দুমাস শুয়ে শুয়ে কি করবে?'

'তোমাকে দেখবো।'

'ডাক্তারের বারণ আছে।'

'কেন?'

'তাতেও নাকি টেনসন হয়।'

'তাহলে কি করবো?'

'কবিতার বই কিনে আনি?'

'তোমাকে পড়তে হবে। কিন্তু মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কি হবে? ওরা কি আমাকে এতদিন কবিতা শুনতে দেবে?'

'ট্রেসি, দুমাস নো বিজনেস। নো টেনসন।'

'ধন্যবাদ! আমি অবাধ্য মেয়ে নই। সেজন্যেই ঝামেলা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চাই। তোমাকে এখন চীফ এক্সিকিউটিভ হিসেবে দুটো কাজ করতে হবে।'

'ট্রেসি, আমার কথা শোনো…'

'না। পুনারকে জানাও, আগামী সপ্তাহে ডিরেক্টরদের কোনো আপত্তি না থাকলে সার্ডিনায় ডিরেক্টর বোর্ডের সভা বসবে। ওই সভায় শেয়ার সম্পর্কে আমি আমার মতামত জানাবো। যাও, এবার কবিতার বই আনো। আর হ্যাঁ। সার্ডিনা ভিলার লোকজনকে এক্ষুণি খবর পাঠাও। ওরা যেন বিকেলের আগেই পৌঁছে যায়।'

ডিনারের আগেই সার্ডিনা ভিলা গমগম করে উঠলো চাকরবাকরের কলকাকলিতে। ডিনারের পর, হাসান ট্রেসিকে শোনালো জীবনানন্দ দাশের হাওয়ার রাত।'

কবিতা শুনতে শুনতে নিজের ভেতর হু-হু করে কাঁদতে কাঁদতে ট্রেসি ভাবলো, কবে শেষ হবে তিন মাসের নির্বাসন। কবে খুনের দায় থেকে মুক্ত হবে হাসান।

[illegible] মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের পরিচালকরা। শুধু বাওয়ার এসেছে একা। [illegible] দুঃখী দেখাচ্ছে ওকে। মায়া হলো ট্রেসির। তাহলে খুনী কে?…

[illegible] দেখে চমকে উঠলো ট্রেসি। গলায় লাল রিবন। লাল রিবন! ট্রেসির [illegible] আগেও ডরিসের গলায় রিবন দেখেছে ও। কিন্তু লাল কিনা মনে [illegible] কোনো বিস্ময় প্রকাশ পেলো না ট্রেসির।

[illegible] গলায় লাল রিবন দেখে লাফিয়ে উঠলো ডরিস।

[illegible] ট্রেসি। তুমিও কি রিবন পরতে ভালবাসো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শুধু লাল।'

'কেন? লাল তো হাসানের পছন্দ। ডু ইউ লাইক হিম?'

একি শুনছে ট্রেসি! হাসানের পছন্দের খবর কেমন করে জানে ডরিস। ওদের কি চেনাশোনা আছে?

'ট্রেসি, চুপ করে আছো কেন?' ওর রিবনের গিঁটে আদর করতে করতে ডরিস বললো, 'লণ্ডনে এসো। আই উইল গিভ ইউ অ্যা নাইস টাইম।'

'ডরিস, আমি তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না।'

'লণ্ডনে এসো, তাহলেই বুঝবে। আমি পুরুষ হতে ভালবাসি। নাইস গেম। ভুলতে পারবে না।'

গা ঘিনঘিন করে উঠলো ট্রেসির। ডরিস একদম কলগার্লের মতো কথা বলছে। আর হাসান ওর সাথেই···

কিন্তু লিজিকে দেখে সত্যিই বাঘিনীর কথা মনে পড়লো ট্রেসির।

লিজির ভিতর কোনো লুকোচুরির বালাই নেই।

'ট্রেসি, মাই সুইট সিস্টার, বিশ্রামের পর প্যারিসে এসো। আশা করি, তুমি এখনো কুমারী আছো। উই উইল এনজয়।'

অবাক হয়ে গেল ট্রেসি। মনে পড়ছে সুইজারল্যাণ্ডে ওর বান্ধবীদের কাণ্ড। কিন্তু লিজির ভেতর সম্পদের লোভ আসলো কেমন করে? ও তো একেবারেই অন্য ধাতুতে গড়া।···

সোফিয়া একদম আলাদা।

ওর মধ্যেই ট্রেসি দেখতে পেলো মেয়ার রক্ত ধারা।

'ট্রেসি, মামার জন্যে খুব খারাপ লাগে। অমন শক্তিশালী পুরুষ ইণ্ডাস্ট্রিতে আর হয়তো আসবে না। তুমিও একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেছো শোনো,

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আশা করি, তুমি শেয়ার বিক্রিতে রাজি হবে না।'

'কিন্তু কেন, সোফিয়া? মানুষের সমস্যা থাকতে পারে।'

'সমস্যা! পরিচালকরা সবাই নপুংসক। ওরা শুধু ফুর্তি করতে জানে। কেউই কাজের না। তুমি শেয়ার বিক্রি করবে না। আর তুমি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলো। একটা কথা চুপিচুপি বলে রাখি, কাউকে বলবে না। হাসান একটা রত্ন। ট্রাই টু ক্যাচ হিম। মামা ওকে খুব ভাল বাসতেন।'

'বাবার কথা কিছু শোনাও।'

'মামা সবাইকে খুব ভালাসতেন। উনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না, কেন ওরা শেয়ার বিক্রি করতে চায়? শেষের দিকে খুব নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন মামা। আমার কাছে এসে আবোলতাবোল কথা বলতেন। বলতেন, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে বোধহয় বাঁচানো গেল না। আমি সান্ত্বনা দিতাম। তোমাকে নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তা ছিলো। বলতেন, একটা ভালো ছেলে কোথায় পাই।' তখন শুরু করতেন হাসানের গুণগান।'

'কিন্তু আমি ওদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কেমন করে ওদের বলবো...'

'ট্রেসি, ভুলে যেয়ো না, ইণ্ডাস্ট্রি রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমার। কারো কথায় নেচো না। বাশেভিসের স্বপ্ন নষ্ট করো না।'

পরের দিন বসলো পরিচালকদের সভা।

সবাই ওর দুর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলো।

নোটবই আর কলম নিয়ে পুনার প্রস্তুত কার্যবিবরণী লেখার জন্যে।

'মাননীয় পরিচালকবৃন্দ,' বিছানায় শুয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু গভীর আস্থার সঙ্গে উচ্চারণ করলো ট্রেসি, 'এর আগের সভায় আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি বলে দুঃখিত। আজ আমি তোমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবো না। আমি শেয়ার বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল সবার মুখ।

'কিন্তু ট্রেসি,' যুক্তি দেখালো রিচার্ড, 'এ মুহূর্তে ইণ্ডাস্ট্রি একজন অভিজ্ঞ গভর্ণর চায়। তোমার এবং বাকি সবার ভালোর জন্যে আমি মনে করি এর ভেতরে তোমার নাক না গলানোই ভালো।'

কার্লো ব্যবহার করলো ওর মেয়ে-পটানো বিশেষণযুক্ত বাক্য। 'কারিসিমা তুমি একজন সুন্দরী রমণী। গোটা পৃথিবী তোমার। তুমি কেন ব্যবসার দাস হতে যাচ্ছো? বাইরের পৃথিবী অনেক আনন্দের। ঘুরবে...'

'আমি অনেক ঘুরেছি, কার্লো,' বললো ট্রেসি।

বিড়বিড় করে বললো ভাদিম, 'ট্রেসি, এক দুঃখজনক দুর্ঘটনার কারণে তুমি আজ তোমার বাবার আসনে বসেছো। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তুমি ইণ্ডাস্ট্রি চালাবে। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। তুমি সেগুলোকে আরো জটিল করতে যাচ্ছো।'

গম্ভীর মুখে বাওয়ার জানালো, 'ইণ্ডাস্ট্রি অনেক ঝামেলার মধ্যে আছে। তুমি ঠিক জানো না, ঝামেলাগুলো কতো ভয়ঙ্কর। তুমি শেয়ার এখন বিক্রি করতে না দিলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

তা জানি। কিন্তু আমাকেও জানতে হবে খুনী কে? ইণ্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিলে জানার সে সুযোগ আমার আসবে না। ততদিন আমাকে থাকতেই হবে এখানে।

হাসানের দিকে তাকালো ট্রেসি। 'মি. হাসান, আপনি কিছু বলবেন?'

'মিস মেয়ার, পরিচালকদের অনেক সমস্যা থাকতে পারে। আমি মনে করি না, শেয়ার বিক্রি করলেই ইণ্ডাস্ট্রি বরবাদ হয়ে যাবে।'

'ধন্যবাদ, মি. হাসান। আমিও মনে করি না। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির গভর্ণর হওয়ায় আমারও কিছু দায়িত্ব আছে। পুনার, সিদ্ধান্ত লেখো। আজ থেকে আড়াই মাস পর, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরিচালকমণ্ডলীর সভায় আমি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবো।'

'আড়াই মাস!' সবাই একসঙ্গে জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ দু'মাস আমার বিশ্রাম। আর পনেরো দিন থাকবে আমার হানিমুনের জন্য। এক দুঃখজনক দুর্ঘটনায় আমি গভর্ণর হয়েছি, সে কথা সত্যি। কিন্তু এ কথাও সত্যি, ডেভিড মেয়ারের মেয়ে হিসেবে আমি গভর্ণর হবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। সে সৌভাগ্যকে মাত্র পনেরো দিন উপভোগ করার অধিকার আমার আছে। ধন্যবাদ। পুনার, সভা এখানেই শেষ হচ্ছে।'

এগারো

সার্ডিনা থেকে জুরিখে ফেরার আগে পুনার জানতে চেয়েছিল, 'ও কি অফিসিয়াল কাগজপত্র ট্রেসিকে পাঠাবে?'

'শুধু অত্যন্ত জরুরীগুলো।' হাসতে হাসতে বলেছে ট্রেসি।

দুদিন পর এলো একটা সীলমোহর লাগানো খাম। এক কোণে লেখা, গোপনীয়।' খামের ওপর ট্রেসির নাম ও পদবী।

খাম খুলে ট্রেসি পেলো এক রাসায়নিক ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট। নিচে স্বাক্ষর দিয়েছেন আইভো মরতেল।

রিপোর্ট টেকনিক্যাল শব্দে ভরা। না বুঝেই পড়ে ফেললো ট্রেসি। আবার

পড়লো। আবার। প্রতিবার আগের চেয়ে ধীরে। অবশেষে রিপোর্টের অর্থ খুঁজে পেলো ও।

জুরিখে পুনারকে টেলিফোন করলো ট্রেসি।

'পুনার। আমি আইভো মরতেলের সাথে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে চাই। ওকে পাঠাও।'

লম্বা, একহারা শরীর আইভো মরতেলের। সরু মুখ। চামড়ায় হলদে হলদে ফুটকি। মাথার খুলিতে চুল নেই। অথচ বয়স কতো হবে? খবু বেশি হলে পঁয়ত্রিশ। চোখে মুখে অস্থিরতার ছাপ। মনে হচ্ছে কি এক অস্বতিতে ভুগছে।

ওকে ডেকে পাঠানোর জন্যে ক্ষমা চাইলো ট্রেসি। তারপর এসেছে বলে জানালো ধন্যবাদ।

'মরতেল, আমি তোমার রিপোর্ট পড়েছি,' আস্তে আস্তে বললো ট্রেসি, 'তবে এখানে এমন কিছু শব্দ আছে যার অর্থ আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দয়া করে তুমি রিপোর্টের কথাগুলো ব্যাখ্যা করবে?'

'অবশ্যই,' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো আইভো মরতেল। এতক্ষণের অস্থিরতা আর অস্বস্তি মুছে গেছে ওর চেহারা থেকে। চেয়ার থেকে কিছুটা সামনে ঝুঁকে কথা বলতে আরম্ভ করলো ও। উচ্চারণ সুন্দর, আত্মবিশ্বাসে ভরা।

একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে মরতেল। রিপোর্টের মতো ওর কথাও টেকনিক্যাল শব্দে ভরা। কথা বোঝার চেষ্টাও করছে না ট্রেসি। যা বোঝার ও বুঝে গেছে। মানুষের বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মন্থর করার লক্ষ্যে হাতে নেয়া হয়েছিল এই প্রকল্প। সে কাজের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে মরতেল। ব্যাপারটা চিন্তাও করতে পারে না ট্রেসি। এতো বিস্ময়কর।

শুয়ে আছে ট্রেসি। চুপচাপ। শুনছে। ভাবছে, সারা পৃথিবীতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জীবনে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে মরতেলের ফর্মুলা।

'মিস মেয়ার, এটা বিশ্বাস না করার কোনো কারণ নেই, কেন একজন মানুষ একশো বছর বাঁচতে চাইবে না, কিংবা দেড়শো বছর, অথবা দুশো বছর?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই। আমিও তাই ভাবছি।'

'ইঞ্জেকশন দেবার প্রয়োজন হবে না,' বোঝাচ্ছে মরতেল, 'আমার ফর্মুলায় মিশ্র বস্তুর উপাদানগুলোকে একটা পিল কিংবা ক্যাপসুলে ঢোকানো যাবে।'

অকল্পনীয়! এরচেয়ে বড় সামাজিক বিপ্লব আর কি হতে পারে! এবং মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ঘরে আসবে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার! মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স নিজেই এই ওষুধ তৈরি করবে; তার ওপর অন্য কোম্পানীকে লাইসেন্স দেবে তৈরি করার। পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছরের ওপরে যাদের বয়স তারা দলে দলে ছুটে আসবে এই অলৌকিক ওষুধ কেনার জন্যে।

এই প্রথম আলোর সন্ধান পাচ্ছে ট্রেসি। ওই টাকায় পাওনাদার ব্যাংকগুলোকে ঠাণ্ডা করা যাবে। শেয়ার সমস্যাও আর সমস্যা থাকবে না। কিন্তু জানতে হবে খুনী কে? কে ধ্বংস করতে চায় ইণ্ডাস্ট্রি? নিজের উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল হয়ে পড়লো ট্রেসির।

'মরতেল, তোমার কাজ কতদূর এগিয়েছে?'

'রিপোর্টেই সে কথা বলেছি। আমি ছয় বছর থেকে কাজ করছি। পশুপাখির ওপর পরীক্ষা করা শেষ। মানুষের ওপরও প্রাথমিক পরীক্ষা হয়েছে। ফলাফল পজিটিভ। আমি এখন চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেজন্যেই রিপোর্ট পাঠিয়েছি অনুমতির জন্যে।'

'কে কে এই প্রকল্পের কথা জানে?'

'ডেভিড মেয়ার জানতেন। এটা লাল ফাইল প্রকল্প। অত্যন্ত গোপনীয়। আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে হয় গভর্নর এবং আর একজন পরিচালককে।'

'কোন পরিচালক?' একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে ট্রেসির মেরুদণ্ড দিয়ে।

'মি. বাওয়ার।'

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকলো ট্রেসি। 'কিন্তু এখন থেকে,' একটা একটা ক'রে শব্দ উচ্চারণ করছে ও, 'আমি চাই, তুমি রিপোর্ট সরাসরি আমাকে পাঠাবে। শুধু আমাকে।'

বিস্ময়ে চমকে উঠলো আইভো মরতেল। 'তাই হবে, মিস মেয়ার।'

'আমরা কবে নাগাদ ওষুধটা বাজারে ছাড়তে পারবো?'

'সবকিছু ঠিকমতো চললে দেড় থেকে দুমাস।'

'বেশ। তোমার যদি বাড়তি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে—টাকাপয়সা, যন্ত্রপাতি—আমাকে জানাবে। আমি চাই তুমি দেড় মাসে কাজ শেষ করো।'

'তাই হবে, মিস মেয়ার।'

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোতে লাগলো আইভো মরতেল।

পিছন থেকে ট্রেসি বললো, 'মরতেল, তেমার সাথে কথা বলে আমার খুব ভালো লেগেছে। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি অসুস্থ। দুমাস বিছানা থেকে নড়তে পারবো না। নাহলে এক ছুটে তোমার ল্যাবরেটরীতে যেতাম। আমার দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কী অলৌকিক কাণ্ড তুমি করছো। ধন্যবাদ।'

ঘুরে দাঁড়ালো মরতেল। 'ধন্যবাদ, মিস মেয়ার। ডেভিড মেয়ার আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। আমিও। আপনাকেও আমার ভাল লেগেছে।'

'আমরা তাহলে ওষুধ বাজারে ছাড়ছি?'

'অবশ্যই।'

মরতেল যাবার পর হাসান জানতে চাইলো, 'ট্রেসি, এতক্ষণ মরতেলের সঙ্গে কি নিয়ে বকবক করলে? আমি তো ওর কথা একদম বুঝতে পারি না। ওর কাজ কতদূর এগোলো?'

'তুমি জানো নাকি ওর প্রকল্প?'

'না। ওটা তো লাল ফাইল। ডেভিড মেয়ার একদিন গল্প করতে করতে বলেছিলেন বৈপ্লবিক কাণ্ড করবে মরতেল।'

'আমিও ওর কথা বুঝিনি। তবে কাজ শেষ হতে এখনো বছর চারেক লাগবে। একটা পরীক্ষার ফল নাকি ভালো আসেনি। সেটাই জানাতে এসেছিল।' আশ্চর্য! কেমন করে মিথ্যে কথা বলছি আমি।

'কিন্তু তুমি আর কাজ করতে পারবে না। এটাই শেষ। নো টেনসন।'

'হাসান, কবে যে শেষ হবে দুমাস! আমার ভীষণ টেনসন উপভোগ করতে ইচ্ছে করছে।'

'আমি তাহলে সার্ডিনা থেকে ভাগি। শেষে পুলিস তোমার অপমৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করবে।'

'সেটা হচ্ছে না। আমি তোমার হাতেই মরতে চাই। নাও, এখন কবিতার বই খোলো।'

পরদিন পুনার ট্রেসিকে টেলিফোনে জানালো, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ব্যাংকার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি মি. ওয়ালথার ট্রেসির সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা করতে চায়।

'বস্, আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি। বলেছি, তুমি বিশ্রাম নিচ্ছো। কিন্তু ওয়ালথার কথা শুনছে না। বলছে, ওর পার্টনাররা মানছে না। খুব তাড়াতাড়ি সভা ডাকতে হবে। বস্, আমি কি করবো?'

'ওরা এখানে আসতে রাজি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কাল লাঞ্চের পর সভা ডাকো।'

'দুঃখিত, বস্।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, পুনার বিজনেস ইজ বিজনেস।'

*

ওয়ালথারকে দেখে মানুষ নয়, একটা ফড়িং-এর চেহারা মনে পড়লো ট্রেসির। হাড় জিরজিরে শরীর। কাঠির মতো হাত-পা। গায়ে কালো স্যুট। ওর বসার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এঘরে ঠিকমতো দম নিচ্ছে পাচ্ছে না। আরো পাঁচজন ব্যাংকার এসেছে ওয়ালথারের সঙ্গে। সবার গায়ে কালো স্যুট। সবার চেহারা নিরাসক্ত। দৃষ্টি উদাসীন। ট্রেসির মনে হলো, কেউ স্বাভাবিক মনে আজকের সভাটাকে গ্রহণ করতে পারেনি। ওদের আচরণেও তাই প্রকাশ পেয়েছে।

সভা শুরু হওয়ার আগে পুনার ট্রে-তে নিয়ে এসেছে কফি, তাজা পেস্ট্রি। কিন্তু কেউ-ই ওগুলো স্পর্শ করেনি। এর আগে ট্রেসির লাঞ্চের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেছে ওরা। এটাকে খারাপ লক্ষণ হিসেবে ধরে নিয়েছে ট্রেসি। ওরা পাওনাদার। টাকা ফেরত চাইতে এসেছে। এর বাইরে আর অন্যকিছুতে আগ্রহ নেই।

'প্রথমে, এখানে কষ্ট করে আসার জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' সভা শুরু করলো ট্রেসি।

সবাই চুপ।

জোরে একটা শ্বাস টেনে ট্রেসি জানালো, 'মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের কাছে ব্যাংকের যে অর্থ পাওনা আছে, আমি সে অর্থ ফেরত নেবার সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি।'

ছোট্ট মাথাটা নড়লো ওয়ালথারের। 'দুঃখিত, মিস মেয়ার। আমরা আগেই জানিয়েছি...'

'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি,' বললো ট্রেসি। ঘরের চারদিকে চোখ বোলালো ও। 'আমি যদি ট্রেসি না হয়ে আপনাদের একজন হতাম, আমিও রাজি হতাম না।'

ব্যাংকাররা সবাই ট্রেসির দিকে তাকালো। তারপর বিভ্রান্তের মতো নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো।

'আপনারা ডেভিড মেয়ার জীবিত থাকাকালেই অর্থ ফেরত দেবার জন্যে চাপ দিয়েছেন। আমার মতো আপনারাও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন, মি. মেয়ার একজন মেধাবী ব্যবসায়ী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে আমার মতো একজন অনভিজ্ঞ মহিলাকে সুযোগ দেবার পিছনে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।'

'ধন্যবাদ, মিস মেয়ার। আমার বিশ্বাস আপনি নিজেই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন,' খরখরে গলায় বললো ওয়ালথার। 'আমরা আর কোনো ঝুঁকি...'

'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি,' বললো ট্রেসি।

চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে মেজাজ বিগড়ে গেছে ব্যাংকারদের। চোখ গোল করে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ট্রেসিকে।

ট্রেসিও এক এক করে দৃষ্টি ফেলছে ব্যাংকারদের ওপর। নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে, সবার মনোযোগ পুরোপুরি ওর দিকে কেড়ে নিতে পেরেছে। ওরা সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাংকার। প্রশংসিত। সম্মানিত। ঈর্ষণীয়।

দেখতে দেখতে চেয়ার ছেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো ব্যাংকারদের শরীর। মনোযোগ দিয়ে দেখছে ট্রেসিকে। বোঝার চেষ্টা করছে ওর কথার মানে। ওদের চেহারা থেকে মুছে গেছে বিরক্তি আর অধৈর্যের চিহ্ন। সে জায়গা দখল করেছে কৌতূহল।

'আপনারা সবাই মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে দীর্ঘকাল থেকে চেনেন,' বলে যাচ্ছে ট্রেসি, 'আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই আমার বাবাকে ভালভাবে চিনতেন। এবং আমার বিশ্বাস, আপনারা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতেন।'

কয়েকজন ব্যাংকারের চেহারায় ফুটে উঠলো সম্মতির লক্ষণ।

'আমি ধরে নিতে পারি,' কথায় ছন্দ এসে গেছে ট্রেসির, 'যে সকালে আপনারা শুনেছেন আমি আমার বাবার জায়গা দখল করছি, সে সকালে আপনারা কেউ-ই আপনাদের কফি পান করে তৃপ্তি পাননি।'

একজন ব্যাংকারের ঠোঁটে ফুটে উঠলো হাসির আভা। এরপর উচ্চকণ্ঠে হাসতে আরম্ভ করলো সে।

'মিস মেয়ার, আপনার কথা সত্যি।' তারপর অন্য ব্যাংকারদের দিকে তাকাতে তাকাতে মন্তব্য করলো সে, 'আমি অবশ্য কাউকে কটাক্ষ করছি না, তবে আমি নিজে সেদিন চা কফি খেয়ে মজা পাইনি।'

একজন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো হাসতে হাসতে ট্রেসি বললো, 'আমি আপনাকে দোষ দিতে পারবো না। আমি নিজে হলেও পেতাম না।'

কথা বললো আর একজন ব্যাংকার। 'মিস মেয়ার, আমার কৌতূহল জাগছে। আমরা সবাই জানি এ সভার ফলাফল কি?' হাত বাড়িয়ে সে বললো, 'আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমরা তাহলে এখানে বসেছি কেন?'

'আমরা বসেছি,' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো ট্রেসি, 'এজন্যে যে, এখানে এসেছেন পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যাংকাররা। আমি বিশ্বাস করি না, তারা শুধু ডলার আর সেন্টের হিসেব করে এতো বড় হয়েছে। তাহলে যে কোনো কেরানী এত বড় হতে পারতো। আমি মনে করি, ব্যাংকিং ব্যবসায়ে আরো মেধাবী মানুষের প্রয়োজন।'

'অবশ্যই,' বললো আর একজন ব্যাংকার, 'কিন্তু মিস ট্রেসি, আমরা ব্যবসায়ী, এবং ...'

'এবং মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স একটা ব্যবসা। একটা বিশাল ব্যবসা। বাবার ডেস্কে বসার আগে আমি বুঝতে পারিনি কতো বড় ব্যবসা এই ইণ্ডাস্ট্রি! আমি জানতাম না, কতো মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে এই কোম্পানী! সারা পৃথিবীতে, দেশে দেশে! জানতাম না, ওষুধ বিজ্ঞানে কতো অবদান রেখেছি আমরা! জানতাম না, কতো হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। যদি জানতাম...'

বাধা দিলো ওয়ালথার। 'মিস মেয়ার, আপনার কথাগুলো সত্যি। আপনি

বলেছেনও সুন্দর করে। কিন্তু আমরা আমাদের সমস্যা থেকে সরে যাচ্ছি। আমার ধারণা, আপনাকে নিশ্চয় বলা হয়েছে, শেয়ার হাতছাড়া করলে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স অঢেল নগদ টাকার মালিক হবে। আমাদের ঋণ শোধ করার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি।'

এটাই তোমার ভুল ওয়ালথার··· 'আপনাকে নিশ্চয় বলা হয়েছে'···মনে মনে ভাবলো ট্রেসি। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের বোর্ড সভার আলোচিত কথাগুলো তুমি জানো। তার মানে তোমাকে কেউ বলেছে। অথচ আমার লক্ষ্যই হচ্ছে তাকে চেনা, যে তোমাকে বলেছে। হতে পারে, সে আমার প্রেমিক। কিন্তু তাতে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কিছু যায় আসে না।···

'আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই,' ওয়ালথারের কথা ট্রেসিকে একটুকুও প্রভাবিত করেনি, 'আপনাদের ঋণ যদি পরিশোধ করা হয়, তাহলে সে টাকা কোথা থেকে এসেছে সেটা কি আপনাদের জানার বিষয়?'

ট্রেসিকে দেখছে ওয়ালথার। ওর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ট্রেসির প্রশ্নে। খুঁজে দেখছে কোনো ফাঁদ আছে কিনা। অবশেষে সে বললো, 'না।'

'তাহলে এটাও কোনো ব্যাপার না, আপনাদের ঋণ শেয়ার বিক্রি করে পরিশোধ করা হচ্ছে, না কোম্পানীর নিজস্ব সম্পদ থেকে মেটানো হচ্ছে। যা ব্যাপার তা হলো, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ব্যবসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। আজকে নয়। কালকে নয়। কোনদিনও নয়। আমি শুধু আপনাদের কাছ থেকে কিছুদিনের জন্যে সময় চাইছি।'

শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ওয়ালথার বললো, 'মিস মেয়ার, বিশ্বাস করুন, আমরা ইণ্ডাস্ট্রির ব্যাপারে সমব্যথী। আমরা বুঝতে পাচ্ছি, কি মানসিক সংকটের ভেতর আপনার দিন কাটছে। কিন্তু···'

'মাত্র তিন মাস,' বললো ট্রেসি, 'নব্বই দিন।'

কেউ কথা বলছে না। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। কিন্তু এই

নীরবতা আর অঙ্গভঙ্গি সম্মতির নয়। ট্রেসি দেখতে পাচ্ছে ওদের সৌজন্যহীন নিষ্ঠুর মুখগুলো। দাবার শেষ চাল দেবার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

'আমি···আমি ঠিক জানি না ব্যাপারটা আপনাদের জানানো ঠিক হচ্ছে কিনা,' ইচ্ছে করেই তোতলাচ্ছে ট্রেসি, 'আমি চাইবো, আপনারা কথাটা গোপন রাখবেন। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এমন কিছু আবিষ্কার করবে যা সারা পৃথিবীতে ওষুধ শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাবে।' সাসপেন্স বাড়ানোর জন্যে থামলো ও। 'আমাদের কোম্পানী কয়েক দিনের মধ্যেই একটা নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে। প্রাথমিক অভিক্ষেপ থেকে জানা গেছে, এখন বাজারে আমাদের যেসব ওষুধ আছে, নতুন ওষুধ একাই তাদের পঞ্চাশ ভাগ জায়গা দখল করবে।'

'কি···ধরনের···ওষুধ···,' কথা শেষ করতে পারলো না ওয়ালথার।

ট্রেসি দেখতে পাচ্ছে ঘরের পরিবেশ পাল্টে গেছে।

মাথা দোলালো ট্রেসি। 'দুঃখিত, মি. ওয়ালথার। সম্ভবত আমি ইতিমধ্যে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি। আমি শুধু এটুকু যোগ করতে পারি, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ওষুধ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে। এর সঙ্গে তাল মেলাতে হলে আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিকে সব ক্ষেত্রেই নিজেদের সীমানা বাড়াতে হবে। সম্ভবত দ্বিগুণ। কিংবা কে জানে তিন গুণও হতে পারে। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য, সে সময় আমাদের নগদ অর্থের চাহিদাও বেড়ে যাবে, এবং আমাদেরকে কোনো না কোনো ব্যাংকের কাছ থেকে সে অর্থ ধার নিতে হবে।'

নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো ঝানু ব্যাংকাররা; এবং সে সাথে জানালো সংকেত। নীরবতা ভাঙলো ওয়ালথার নিজেই। 'আমরা যদি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের পুরনো ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নব্বই দিন বাড়িয়ে দেই তাহলে স্বভাবতই আমরা আশা করতে পারি, ভবিষ্যতে ইণ্ডাস্ট্রির বাড়তি অর্থসংস্থানে আমরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবো।'

'অবশ্যই।'

আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো ব্যাংকাররা। হ্যাঁ, একেই বলে জঙ্গলের আইন। ভাবলো ট্রেসি।

'তাহলে,' বললো ওয়ালথার, 'আমরা আপনার কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পাচ্ছি যে আগামী নব্বই দিনের মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রি আমাদেরকে পুরনো ঋণ শোধ করে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ।'

চেয়ারে হেলান দিলো ওয়ালথার। 'আমি সম্মতি জানাচ্ছি।'

'ওয়ালথার, তুমি রাজি হলে আমরাও...'

'ধন্যবাদ। আমি আগেই বলেছি আপনারা শুধু ব্যবসায়ী নন।'

'ধন্যবাদ, মিস মেয়ার।'

'মোস্ট ওয়েলকাম।'

ব্যাংকাররা চলে যাবার পর ঘরে ঢুকলো হাসান। হাসছে ট্রেসি। দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

'কি ব্যাপার, ট্রেসি? হাসছো কেন?'

'ব্যাংকারদের কাবু করে ফেলেছি। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা তিনমাস বাড়লো।'

'কিন্তু তারপর?'

'জানি না। তখন তো ইণ্ডাস্ট্রি আমি চালাবো না।'

'তাহলে কে চালাবে?'

'তুমি।'

'হেঁয়ালি করো না।'

'হেঁয়ালি নয়। দু'মাস পর বিয়ে। তারপর ইণ্ডাস্ট্রি তোমার। কেমন করে সামলাবে জানি না। কিন্তু এখন কবিতা।'

বারো

পরদিন লণ্ডন থেকে টেলিফোন করলো রিচার্ড। রিসিভার তুললো ট্রেসি।

'হ্যালো, ট্রেসি। মাই সুইট মিস্টার। ভালো আছো তো? হাসান কোথায়?'

'হ্যালো, রিচার্ড। হ্যাঁ, ভালো। ওকে দিচ্ছি।'

'রিচার্ড, হাসান বলছি।'

'হাসান, তাড়াতাড়ি এসো। তোমার লাল ফাইলটা এসেছে।'

'আচ্ছা, রাতে আসছি।' রিসিভার নামালো হাসান।

'ট্রেসি, রাতে লণ্ডনে যেতে হচ্ছে।'

'কেন?'

'আমার একটা লাল ফাইল এসেছে। তুমি কিন্তু বিছানা থেকে একদম নামবে না।'

'কবে ফিরবে?'

'ভোরেই।'

'প্রজেক্টটা কিসের?'

'বাংলাদেশের দেশীয় গাছপালা থেকে ওষুধ বানানোর প্রকল্প। মেয়ার অ্যাণ্ড

সঙ্গের ল্যাবরেটরীতে গবেষণা চলছে। অর্থসংস্থান করছি আমি। রিচার্ড হচ্ছে মেয়ারের প্রতিনিধি। তোমার বাবা ইচ্ছে করেই ওকে দায়িত্ব দিয়েছেন। শোনো, আমি কোথাও বেড়ানোর সুযোগ পেলে ফিরবো না। ভালোই হলো। নো টেনসন। তোমার জন্যে কয়েকটা কবিতার বই রেখে যাচ্ছি।'

'পড়ে শোনাবে কে? না, তুমি ভোরেই ফিরছো। কি, কথা দিচ্ছো?'

'ট্রেসি, আমার আর ভালো লাগছে না। কবে টেনসন শুরু হবে?'

'আমারও লাগছে না। দুমাস পর।'

'না। একমাস তিন সপ্তাহ।'

'ঠিক। পঞ্চাশ দিন।'

'তাহলে বিদায়।'

'না।'

'কি?'

'কাছে এসো।'

ভোরে, টেমস নদীতে পুলিস বোটে ডিউটি করার সময় টেমস ম্যারিন পুলিস ডিভিসনের কনেস্টেবল নিক্সন দেখতে পেলো দশ গজ দূরে একটা মাছ ভাসছে। সাঁদা। পেটটা ফুলে আছে।

চিৎকার করে ডাকলো নিক্সন, 'সার্জেন্ট, দশ ডিগ্রী দূরে একটা মাছ ভাসছে। মনে হচ্ছে একটা বড় শার্ক। মরা।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সার্জেন্ট টমাস জানতে চাইলো, 'কোথায়?'

'ওই যে।'

'বেশ বড় তো।'

'হ্যাঁ।'

'চলো। বোট ঘোরাও।'

ধীরে ধীরে ভাসমান বস্তুর কাছে এলো বোট।

কিন্তু এ কি? মাছ নয়। ভাসছে একজন তরুণী। মরা। সম্পূর্ণ নগ্ন।

তরুণীকে টেনে বোটে তুললো নিক্সন আর টমাস।

মৃত তরুণীর শরীরে যৌন মিলনের চিহ্ন। গলায় লাল রিবন।

সকাল আটটা। টেমস ম্যারিন পুলিস ডিভিসন।

অফিসে বসে আছে সিআইডি ডিটেকটিভ উইলিয়াম। কম্পিউটার এক্সপার্ট সে। তাছাড়া ধর্ষণ কেসে বিশেষজ্ঞ।

ঘরে ঢুকলো টমাস। 'উইলিয়াম, আর বলো না, সকালেই একটা ঝামেলায় পড়লাম।'

'ধর্ষণ?'

'সেরকমই মনে হচ্ছে। তবে ভিকটিম মৃতা।'

'মানে?'

'চলো।'

মর্গে মেয়েটাকে দেখেই চমকে উঠলো উইলিয়াম। কি যেন মনে পড়ছে।...

লণ্ডনে হেড অফিসে ছুটলো উইলিয়াম।

কম্পিউটার বিভাগে ঢুকে একটা প্রোগ্রাম লিখলো সে।...লাল রিবন। ধর্ষিতা। সম্পূর্ণ নগ্ন। তরুণী থেকে যুবতী, ...এরকম কোনো ফাইল আছে?'

কম্পিউটারের পর্দায় উত্তর এলো।...হ্যাঁ। হামবুর্গ বেশ্যাপল্লী। সেপ্টেম্বর আঠারো। একটা স্নাফ ফিল্মে অভিনয় করছিল। চরম মুহূর্তে গলা টিপে মারা হয়েছে। একজন দর্শক ছিলো।...লিসবন, সেপ্টেম্বর দশ। ...প্যারিস, জানুয়ারী পনেরো। ...রোম, জানুয়ারী এক। ...জুরিখ, ডিসেম্বর দশ।...বন, নভেম্বর সাত। ...হঠাৎ গণ্ডগোল আরম্ভ হলো কম্পিউটারে। পর্দায় ভেসে উঠলো, 'সরি, উইলিয়াম, আমাদের কাছে এই মুহূর্তে একটা নতুন খবর এলো। চল্লিশ সেকেণ্ড

অপেক্ষা করো…'

উইলিয়াম লেখাটা দু'বার পড়ার আগেই কম্পিউটার লিখতে আরম্ভ করলোঃ 'লণ্ডন, ভোর সাতটা। টেমস নদী। একজন তরুণীর ভাসমান লাশ। গলায় লাল রিবন।…সকাল আটটা। লণ্ডন হাইড স্ট্রীট। পার্কের কোণে এক অপরিচিত যুবক গুলি খেয়ে মারা যায়। ব্রিফকেসে ওই তরুণীর স্নাফ ফিল্ম। তদন্ত চলছে। ক্রিমিনাল কেস চীফ চার্লস দায়িত্ব প্রাপ্ত…'

চার্লসের দপ্তরে ছুটলো উইলিয়াম।

ঘরে ঢুকে উইলিয়াম দেখে, চব্বিশ জন নারী পুরুষ বসে আছে। সামনে একটা পর্দা। এক কোণে প্রজেক্টর নিয়ে কথা বলছে চার্লস।

শেষের চেয়ারটা টেনে বসতে যাবে উইলিয়াম, এমন সময় ওকে দেখতে পেলো চার্লস।

'এই যে উইলিয়াম, তুমি এসে গেছো। মজার ঘটনা মনে হচ্ছে। মোটিভের গন্ধ পাচ্ছি। ভালো করে শোনো।

'বেশ কিছুদিন থেকে স্নাফ ফিল্মের গল্প শুনছি। এটা এক ধরনের পর্নো ছবি। দৃশ্যের শেষে নায়িকাকে মেরে ফেলা হয়। অনেক চেষ্টা করেও পুলিস ওগুলোর সন্ধান পায়নি। কারণটা অবশ্য বোঝা যায়। স্নাফ ফিল্ম দর্শকদের জন্যে তৈরি করা হয় না। এগুলো তৈরি করা হয় ধনী বিকৃত-রুচির মানুষদের জন্যে। সাধারণত তারা নিজেরাই দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকে।'

চশমা খুলে কাচ মুছতে লাগলো চার্লস। 'কিন্তু গত আঠারো তারিখে হামবুর্গে একটা স্নাফ ফিল্ম উদ্ধার করে পুলিস। ঘরে নায়িকার লাশও পাওয়া যায়। আমি ছবিটি দেখেছি, দৃশ্যে একজন দর্শকও ছিলো। কিন্তু তার চেহারা চেনা যায়নি। যাক্।

'আজ সকালে হাইড পার্কের কোণায় এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে সে মারা যায়। লাশটাকে এখনো সনাক্ত করা যায়নি। তার

সঙ্গে ব্রিককেসে একটা ফিল্ম পাওয়া যায়। পুলিস ল্যাবরেটরীতে ফিল্মটাকে ডেভেলপ করা হয়। এটাও একটা স্লাফ ফিল্ম। আসো, এখন ছবিটা দেখা যাক।'

চার্লস প্রজেক্টর চালু করতেই পর্দায় ভেসে উঠলো দৃশ্য।

ছোট্ট একটা অন্ধকার ঘর।

খাটের ওপর পাশাপাশি বসে আছে অভিনেতা, অভিনেত্রী।

অভিনেতার বয়স তিরিশের ঘরে। নিগ্রো। পেশীবহুল দেহ। বুকে লোম নেই। গায়ে কোনো পোশাক নেই।

অভিনেত্রী টেমস নদীতে পাওয়া সেই মৃত তরুণী। আঠারো থেকে বিশের মধ্যে বয়স। সোনালী চুল। শরীরে কোনো কাপড় নেই। শুধু গলায় একটা লাল রিবন।

এক কোণে একটা টুলে বসে আছে দর্শক। মাথায় কালো হ্যাট। চোখে নীল চশমা। চেনা যাচ্ছে না।

অভিনেতা অভিনেত্রী মুখোমুখি বসে হাসছে।

দর্শক চিৎকার করে বললো, 'অল রাইট। অ্যাকশন।'

আলিঙ্গন বদ্ধ হলো অভিনেতা অভিনেত্রী।...

দ্রুত শ্বাস পড়ছে দর্শকের। সামনে ঝুঁকে গেছে শরীর। চোখ দুটো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে অভিনেতা অভিনেত্রীর ...

দর্শক চিৎকার করে উঠলো, 'ইয়েস।'

তরুণী চিত হয়ে অভিনেতার কাছে সমর্পণ করলো ওর উত্তপ্ত শরীর।

অভিনেতার শরীরের নিচে হারিয়ে গেল অভিনেত্রীর শরীর।...

উত্তেজনা বাড়ছে দর্শকের।...

দৃশ্য গড়িয়ে যাচ্ছে চরম মুহূর্তের দিকে।...

চিৎকার করে উঠলো দর্শক, 'এখন।'

অভিনেতা টিপে ধরলো অভিনেত্রীর টুঁটি।...

দর্শকের ঠোঁটে বিজয়ের হাসি।...

চার্লসের ডেস্কের সামনে বসে আছে উইলিয়াম।

'আচ্ছা, চার্লস, তুমি বললে মোটিভের গন্ধ পাচ্ছো? কেন, বলো তো?'

'হামুবুর্গের ছবিটাতেও মেয়েটির গলায় লাল রিবন ছিলো। আর দর্শকের চেহারাও হুবহু এক। যদিও চেনা যাচ্ছে না।'

'তদন্ত শুরু হয়েছে?'

'হ্যাঁ। হামবুর্গ অনেকদূর এগিয়েছে। দাঁড়াও, আমি ফোন করছি।'

'হ্যালো। হামবুর্গ সিআইডি?'

'হ্যাঁ। কে?'

'লণ্ডন সিআইডি থেকে চার্লস। চীফ। কে, ব্রান্ট?'

'হ্যাঁ। কি খবর?'

'ওই লাল রিবন আরো একটা পাওয়া গেছে।'

'তাই? আমাকে কপি পাঠাও। আমরা খসড়া রিপোর্ট পেয়েছি।'

'জানানো যাবে?'

'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোপনীয়। তবে তোমাকে বলছি। কাউকে জানাবে না। কেননা পৃথিবীর একটা নামী ওষুধ প্রতিষ্ঠানের নাম এর সঙ্গে জড়িত...'

'ওষুধ প্রতিষ্ঠান! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শোনো। আমরা তদন্তে নেমে দেখি, বাজারের ফিল্ম কোম্পানীগুলো ওই ফিল্ম তৈরি করে না। এবং বাজারে ও জিনিস পাওয়াও যায় না। শুরু হলো ফিল্মের ওপর গবেষণা। দেখা গেল, যে কাঁচামাল দিয়ে এই ফিল্ম বানানো হয় তা একটি ওষুধের বাই প্রোডাক্ট। এখন পর্যন্ত খসড়া রিপোর্ট অনুযায়ী ওই ওষুধ মাত্র একটা কোম্পানীই বানায়। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স।'

'তোমরা সব কোম্পানী দেখেছো?'

'না। পঞ্চাশ ভাগ। আরো দিন সাতেক যাবে। তুমি তোমার ফিল্মের কপি পাঠাও। আর তাড়াতাড়ি ওটাকে ল্যাবরেটরীতে নিয়ে যাও।'

'তাই হবে।' রিসিভার নামালো চার্লস। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'চার্লস, ঘটনা তো শুনলাম। কিন্তু মোটিভ…'

'উইলিয়াম, এখন পর্যন্ত পুলিসের খাতায় সাতটা লাল রিবন কেস জমা পড়েছে। শেষের দুটোতে ফিল্মও পাওয়া গেল। দর্শকের চেহারা একই রকম। আর সাতটা লাল রিবন তরুণীর লাশের মধ্যেও যথেষ্ট মিল আছে। সবাইকে মারা হয়েছে গলা টিপে। সারা শরীরে যৌন মিলনের চিহ্ন। শ্বাসরোধ করা হয়েছে উত্তেজনার শেষ মুহূর্তে।'

'ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমাদের করার কিছু নেই। ততোদিন কি চুপচাপ বসে থাকবো?'

'ঠিক বলেছো। হামবুর্গের ফিল্মের সঙ্গে আমাদের ফিল্ম মিললেই কেসটা শক্ত হবে। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি বলো? তবে তুমি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের লণ্ডন শাখায় ঘোরাঘুরি করতে পারো।'

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের লণ্ডন শাখায় ঘোরাঘুরির তৃতীয় দিনে উইলিয়াম দেখতে পেলো ডরিসকে। দেখেই চমকে উঠলো সে। একি! গলায় লাল রিবন। খোঁজ নিয়ে দেখলো, ডরিস লণ্ডন শাখার পরিচালক রিচার্ডের স্ত্রী। গায়ে কাঁটা দিলো উইলিয়ামের।

খবরটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল চার্লস।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো ল্যাবরেটরী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গিলবার্ট। হাতে রিপোর্ট। রিপোর্ট পড়ে আরো গম্ভীর হয়ে গেল চার্লস। হামবুর্গের ফিল্ম আর লণ্ডনের ফিল্ম হুবহু এক। কাঁচামালও এক।

গিলবার্ট যাবার পর উইলিয়াম বললো, 'বস্, তোমার কথাই ঠিক। আমিও মোটিভের গন্ধ পাচ্ছি।'

'তা না পেলেই ভালো হতো, উইলি।'

'কেন?'

'স্যার রিচার্ড শুধু পার্লামেন্টের সদস্যই নয়, ওর বাবা খুব জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। সাবধান। একটু এদিক ওদিক হলেই আমাদের মান ইজ্জত থাকবে না।'

'তাহলে কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?'

'না, না। তা কেন। ক্লু যখন পেয়েছো, মাঠে তো নামতেই হবে। তবে সাবধান। খুব গোপনে।'

'জানি না, এটা ক্লু কি না। তবে মহিলার চেহারা সাংঘাতিক। যাক। আমি তো নামছি। তুমি কিন্তু চুপ করে থেকো না। তাড়াতাড়ি খবর নিতে হবে, ওই ওষুধ মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করে কিনা।'

'উপদেশ দেবার অভ্যেস ছাড়ো, উইলি। নিজের চরকায় তেল দাও। মহিলার চেহারা সুন্দর হলে তোমার কি? তুমি তো এখনো সন্ন্যাসী।'

তেরো

নভেম্বর, পনেরো।

জুরিখ। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স। হেডকোয়ার্টার।

বিশ্রাম শেষে কাজে যোগ দিয়েছে ট্রেসি। বাবার রুমে বসে আছে। মন ভালো নেই। এখন পর্যন্ত মরতেলের কাছ থেকে কোনো খবর আসেনি। অথচ ও আশা করেছিল দেড় মাসেই সব শেষ হবে। না, কিছু ভালো লাগছে না। হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো দিন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ট্রেসি।

ঘরে ঢুকলো পুনার। 'বস্, আইভো মরতেল এসেছে। পাঠাবো।'

'হ্যাঁ।' উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে ট্রেসির শরীর।

ভেতরে ঢুকলো আইভো মরতেল। হাসছে।

ওর মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে ট্রেসি। 'বসো, মরতেল।'

বসলো মরতেল। হাসছেই। 'মিস মেয়ার, আমি দুঃখিত।'

'বুঝেছি, মরতেল। আরো সময় লাগবে, না? না, তোমার কি দোষ।'

'না, মিস মেয়ার। এতো সময় নেবার জন্যে দুঃখিত। কথা ছিলো দেড় মাসে…'

'মরতেল! মানে…'

'হ্যাঁ, মিস মেয়ার। কাল রাতে চূড়ান্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছিলাম। একটু আগে রেজাল্ট পেয়েছি…'

'পজিটিভ…'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচালে, মরতেল। তুমি জানো না, তোমার আবিষ্কার শুধু মানুষের ভাগ্যই পাল্টাবে না, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ভাগ্যও আজ তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মরতেল, আমি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের যোগ্য প্রতিনিধি নই, কিন্তু তোমার প্রতিভার মর্যাদা দিতে কখনো কার্পণ্য করবো না। এখন বলো, ওষুধ বাজারে ছাড়ার অনুমতির জন্যে আমরা কবে নাগাদ দরখাস্ত পাঠাতে পারবো?'

'খুব বেশি হলে সাতদিন। তিন থেকে চারদিন লাগবে আমার ওষুধের স্যাম্পল তৈরি করতে। আসি, মিস মেয়ার।'

'মরতেল, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স এবং আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'ডোন্ট মেনশন। ডেভিড মেয়ার আমাকে খুব ভালবাসতেন।'

'আমিও।'

ডেস্কে ফাইলের পাহাড় জমেছে। রুমে ঢুকে ওগুলো দেখে আজ সকালে ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল ট্রেসির। কখনো ওগুলো নিয়ে কাজে বসবে কিনা সে নিয়েও সন্দেহ ছিলো তার। কিন্তু মরতেল চলে যাবার পর হঠাৎ ফাইলগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো ওর চোখে। ভাবলো, এক নিশ্বাসে যদি ওগুলোর কাজ শেষ করতে পারতাম।

ইন্টারকমে পুনারকে ডাকলো ট্রেসি। 'পুনার, দ্য গ্রেট সেক্রেটারী, তোমার শরীর আজ ভালো তো?'

'কেন, বস্?'

'আজ হয়তো সারারাত কাজ করতে হতে পারে।'

'হঠাৎ।'

'ডেস্কের সব ফাইল শেষ করে কাল সকালে বিয়ের পিঁড়িতে বসবো।'

'তাহলে অলওয়েজ রেডি।'

'ধন্যবাদ, পুনার।'

হাসানের বোতাম টিপলো ট্রেসি। 'হাসান, আমাকে একটু হেলপ করবে?'

'আসবো?'

'হ্যাঁ।'

কাজ করতে বসলো পুনার, হাসান, ট্রেসি। প্রথমে মনে হয়েছিল বিরক্তি আসবে। কিন্তু কাজে নেমে দেখা গেল, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো।

মাঝে মধ্যেই ফাইলের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে ট্রেসি আর হাসানের। কখনো জিতছে ট্রেসি, কখনো হাসান। উপভোগ করছে পুনার।

সময় বয়ে চললো বাতাসের মতো। একসময় ঘড়ির কাঁটা এসে ঠেকলো মধ্যরাতে। মাঝেমাঝে হাই তুলছে ট্রেসি। 'পুনার, তোমার বস্‌কে একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াও।'

হাসানের কথায় সত্যি উঠে দাঁড়িয়েছে পুনার, এমন সময় বেজে উঠলো টেলিফোন। টেলিফেন! এতো রাতে!

'হ্যালো।' রিসিভার তুললো ট্রেসি।

'ট্রেসি। হাসান কোথায়?' লিজির গলা।

'লিজি, এতো রাতে?'

'হ্যাঁ। খুব আর্জেন্ট। আমি আর ভাদিম শেয়ার নিয়ে একটা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। হাসান কোথায়?'

'খুব দরকার? আমরা কাজ করছি।'

'এক রাতের জন্যে ছাড়ো না। ভয় পেয়ো না। ওকে ছাড়া কাজ হবে না। আর তুমি··· তুমি কবে আসছো?'

'ধরো, হাসানকে দিচ্ছি।'

'হ্যালো, হাসান।'

'বলো।'

'আসো না।'

'কোথায়?'

'কেন, ভুলে গেলে লেস্ট ব্যাঙ্কে আমাদের প্রিয় রেস্তোরাঁটা। আসছো তো?'

'অবশ্যই। যেহেতু এটা বিজনেস।' চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে হাসানের।

হাসানের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল ট্রেসি। 'হাসান, এনি থিং রং?'

'লিজি নিজেই একটা জ্বলজ্যান্ত সমস্যা। এতো রাতে ওর মাথায় কোন ভূত চেপেছে, কে জানে? তুমি আর কতক্ষণ থাকবে? আজ বাদ দাও। কাল দেখা যাবে।'

'না, আজকেই শেষ করতে হবে। পুনারকে কথা দিয়েছি।'

'কি কথা?'

'সেটা অতীব গোপনীয়।' মুচকি-মুচকি হাসছে ট্রেসি।

'ঠিক আছে। নারীর মন বিধাতাও বোঝেন না, আমি কোন ছার। গুড নাইট।'

হাসান চলে যেতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো ট্রেসির। ঈর্ষা? লিজি তো বাঘিনী। ওর সঙ্গেও কি হাসানের মেলামেশা আছে?' ডরিস···লিজি···শেয়ার···

হাসান চলে যাবার পর কাজে আবার মন ফেরালো ট্রেসি। কিন্তু এ কি, মন বারবার হাসানের স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছে কেন? ভাবতে ভাবতে কারণটা সে আবিষ্কার করলো।

মরতেলের মুখ থেকে খবরটা শোনার পর থেকেই কথাটা প্রেমিক হাসানকে বলার জন্যে ছটফট করছে ট্রেসির প্রেমিকা মন। অথচ বলেনি। হাসান থাকার মুহূর্তে এই বোধটা উসখুস করলেও মাথা চাড়া দেয়নি, কিন্তু ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বোধটা পাপবোধে রূপান্তরিত হয়ে খামচে ধরেছে ওকে।

কিন্তু হাসান? হাসানও তো কিছু বললো না ওকে। প্যারিস থেকে কখন ফিরবে? পৌঁছে খবর দেবে কিনা? বিদায়ও জানায়নি। দুজন অপরিচিত যুবক যুবতীর মতো আচরণ করেছে ওরা। কেন?...

পুনারের ডাকে বাস্তবে ফিরলো ট্রেসি। 'বস্, আনমনা হয়ে কি ভাবছো? যেতে না দিলেই পারতে।'

'সত্যি, ভুল হয়ে গেছে, পুনার। যাক্। এসো, হাত লাগাও।'

রাত দু'টোয় কাজ শেষ হলো ওদের।

'আর কাজ আছে, বস্?' হাই তুলতে তুলতে বললো পুনার। ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ।

'না। যথেষ্ট হয়েছে, পুনার। ধন্যবাদ। কাল তোমার ছুটি।'

উঠে দাঁড়ালো ট্রেসি। এতক্ষণ ধরে বসে থেকে সমস্ত শরীরে খিল ধরেছে।

'ধন্যবাদ, বস্। আমি পরশু সকালে এসেই সবকিছু টাইপ করে রাখবো।'

'তোমার তুলনা হয় না, পুনার।'

কোট আর পার্স নিয়ে ঘরের বাইরে এসে পুনারের জন্যে দাঁড়ালো ট্রেসি। পুনার বেরুতেই একসাথে এগোলো ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে করিডরের শেষ মাথায় এলো ওরা। ওখানে অপেক্ষা করছিল এক্সপ্রেস লিফট। দরজা খোলা।

লিফটের ভেতরে ঢুকলো দুজনে।

লবির বোতাম টেপার জন্যে হাত বাড়ালো ট্রেসি, এমন সময় দুজনেই শুনতে পেলো ট্রেসির ঘরে ফোন বাজছে।

'বস্, তুমি থাকো। আমি ধরছি।'

'না, পুনার। হয়তো হাসান করেছে। যাওয়ার সময় ও কিছুই বলে যায়নি। তুমি থাকো। আমার জন্যে অপেক্ষা করো না। গুড নাইট।'

'গুড নাইট। পরশু দেখা হচ্ছে।'

নিচতলায়, লবিতে পাহারারত নাইট গার্ড এলেভেটর কন্ট্রোল বোর্ডের দিকে তাকালো। বোর্ডের মাথায় লাল বাতিটা জ্বলছে। তারপর আলো নিচে নামতে আরম্ভ করলো। এটা এক্সপ্রেস লিফটের সাংকেতিক আলো। তার মানে, মিস মেয়ার নিচে নামছেন।

এক কোণে, একটা চেয়ারে বসে ট্রেসির শোফার একটা ম্যাগাজিনে ছবি দেখতে দেখতে ঝিমুচ্ছে। নাইট গার্ড ওকে ডাকলো। 'আর্নল, ওঠো, বস্ নামছে।'

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়ালো আর্নল।

হঠাৎ, অ্যালার্ম বেলের তীব্র চিৎকারে ছারখার হয়ে গেল লবির শান্ত পরিবেশ।

এলেভেটর কন্ট্রোল বোর্ডের দিকে তাকাতেই চোখে ধাঁধা লাগলো নাইট গার্ডের। সাংকেতিক আলোটা কাঁপতে কাঁপতে প্রচণ্ড গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামছে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এক্সপ্রেস লিফট?

'হায় কপাল!' অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে বোর্ডের দিকে ছুটলো গার্ড।

বোর্ডে পৌঁছেই হেঁচকা টান মেরে একটা প্যানেল খুললো ও। তারপর এমারজেন্সী স্যুইচ টিপে সক্রিয় করে তুলতে চাইলো সেফটি ব্রেক। কিন্তু কাজ হলো না। লাল আলো নামছে প্রচণ্ড গতিতে।

আর্নলও ছুটে এসেছে কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে।

গার্ডের ভয়ার্ত চোখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠলো ও। 'কি হয়েছে…'

'ভাগো।' চিৎকার করে উঠলো গার্ড। 'সব চুরমার হয়ে যাবে।'

এক দৌড়ে লবির শেষ প্রান্তে চলে এলো ওরা।

কাঁপতে শুরু করেছে লবি। যেমন করে প্লেন আকাশে ওড়ার আগে কাঁপে রানওয়ে।

দাপাতে দাপাতে লবিতে নেমে এলো দিশাহারা লিফট।

চোখ বন্ধ করলো আর্নল, গার্ড।

ভেসে এলো একটা মরণ চিৎকার। সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ।

থরথর করে কেঁপে উঠলো গোটা বিল্ডিং। যেন সামলাচ্ছে একটা ভূমিকম্পের ছোবল।

মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের এক্সপ্রেস লিফট দুর্ঘটনার দুদিন পর। সকাল দশটা।

জুরিখ পুলিসের ক্রিমিনাল বিভাগের চীফ ইন্সপেক্টর ভেন্দার গাজ নিজের ডেস্কে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ডেস্কের ওপর পড়ে আছে গোয়েন্দা বিভাগের ডিটেকটিভদের দেয়া রিপোর্ট। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সিকিউরিটি বিভাগের সহায়তায় এই রিপোর্ট দুদিন দুই রাত খেটে তৈরি করেছে তারা।

এই রিপোর্ট একটু আগে পড়া শেষ করেছে ভেন্দার। তারপর থেকেই ঝিমঝিম করছে মাথা। ডিটেকটিভরা সবাই সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে ঐকমত্যে পৌঁছুছে। 'আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি, ষোলই নভেম্বর ভোর দুটো তিন মিনিটে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের হেড অফিস জুরিখে যে এক্সপ্রেস লিফটের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা আকস্মিক ব্যাপার নয়, পূর্ব পরিকল্পিত। দোষী ব্যক্তি সনাক্তের জন্যে প্রয়োজনীয় অনুমতি পেলে আমরা তদন্তে নামতে পারি।'

ভাবছে ভেন্দার। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনুমতি ঝটপট আনতে হবে।

ঘরে ঢুকলো উইলিয়াম।

উইলিয়ামকে দেখে ভেন্দারের হতাশা কিছুটা কাটলো।

কয়েক বছর আগে একটা ইন্টারন্যাশনাল কেসে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা। তখন উইলিয়ামের মেধার পরিচয় পায় ভেন্দার। এবং ভালবেসে ফেলে ওকে। গতরাতে চার্লস লণ্ডন থেকে ভেন্দারকে টেলিফোনে জানিয়েছে ঃ 'উইলিয়াম কাল

জুরিখে যাচ্ছে; সম্ভবত আবারো জুরিখ আর লণ্ডনকে একসাথে কাজ করতে হবে, সূত্র; মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স।'

'গুড মর্নিং, বস্।'

'গুড মর্নিং, উইলিয়াম। এসো। বসো।'

'কি ব্যাপার, বস্? মুখ গোমড়া কেন?'

'উইলিয়াম, তুমি আসার আগেই আমরাও মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ঝাপলায় জড়িয়ে পড়েছি।'

'মানে?'

'দুদিন আগে ভোর রাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট লিফট ক্রাশ করেছে।'

'হ্যাঁ। মনে পড়ছে। খবরের কাগজে পড়েছি। দুর্ঘটনা?'

'না। স্যাবোটেজ।'

'বলেন কি? মোটিভ?'

'এখনো নিশ্চিত নই। তবে মারা গেছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সেক্রেটারী। ম্যানেজিং ডিরেক্টরও লিফটে ছিলেন। শেষ মুহূর্তে নেমে যান।'

'তাহলে টার্গেট কে?'

'সেটাই তো বুঝতে পাচ্ছি না। যাক্। এখন তোমার কথা বলো।'

'স্নাফ ফিল্মের কথা তো শুনেছেন। পরপর ওরকম দুটো ফিল্ম পাওয়া গেছে। ফিল্মটা তৈরি করে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স। এবং নিজেরাই ব্যবহার করে। এছাড়া আরো ব্যাপার আছে। ওই দুটো ছবির নায়িকার গলায় ছিলো লাল রিবন। কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। লণ্ডন শাখার ডিরেক্টরের স্ত্রী গলায় লাল রিবন পরে।'

'তাহলে মরেছো। কেননা ব্যাপার ওখানেই শেষ নয়…'

'মানে?'

'মানে, বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ট্রেসি মেয়ারও গলায় লাল রিবন পরেন।'

'মরেছি।'

'হ্যাঁ। এখন তাড়াতাড়ি চলো।'

পুনারের মৃত্যুর পর ট্রেসি দুদিন অফিসে আসেনি। গতকাল শেষকৃত্য ছিলো। আজই প্রথম অফিসে আসছে ও।

লবিতে ঢোকার সময় বুক কাঁপতে লাগলো ট্রেসির। যন্ত্রের মতো জবাব দিলো ডোরম্যান আর গার্ডদের সম্ভাষণের। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় ও তাকালো লিফটের সারির প্রান্তে। মেকানিকরা কাজ করছে।

মনে পড়ছে পুনারের কথা। অকস্মাৎ একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনের পর্দায় ভেসে উঠলো ওর।...পুনার নয়, বারো তলা থেকে ট্রেসি নামছে নিয়ন্ত্রণ হারানো এক্সপ্রেস লিফটে। নামছে না। দ্রুতগতিতে পড়ে যাচ্ছে মৃত্যুর গুহায়। অবর্ণনীয় আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে শরীর। চিৎকার করছে। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। ...ওটা কি দুর্ঘটনা, নাকি কেউ ওকে খুন করতে চেয়েছে?...

লিফটের সারির দিকে তাকিয়ে ট্রেসির মনে হলো, বাকি জীবনে আর কখনো এক্সপ্রেস লিফটাতে চড়তে পারবে না ও।

অফিস রুমের দরজায় ওকে সম্ভাষণ জানালো নতুন সেক্রেটারী জুলিয়া।

ডেস্কে বসে ট্রেসি দেখে অনেক ফাইল, চিঠি পত্র; কিন্তু ওগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে জুলিয়া।

কি করবে ও? কিছু ভালো লাগছে না। কাজে মন বসছে না। হাসানকে ডাকবে? প্যারিস থেকে ফেরার পর কেমন গম্ভীর গম্ভীর হয়ে আছে। কথা বললে অ্যমনস্কের মতো উত্তর দেয়। থাক। ওকে বিরক্ত করে কাজ নেই।

মরতেলের খবর নিলে কেমন হয়? কিন্তু হলো না ওকে ডাকা।

ইন্টারকমে জুলিয়া জানালো, মিস মেয়ার, চীফ ইন্সপেক্টর ভেন্দার আর লণ্ডনের একজন ডিটেকটিভ উইলিয়াম আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

লাগিতে অপেক্ষা করছে।'

'আমার কাছে আবার কি? আমি তো আমার জবানবন্দি দিয়েছি।'

'আমিও জানতে চেয়েছিলাম। তারা বলছে, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় এবং জরুরী।'

'ঠিক আছে, আসতে বলো।'

ঘরে ঢুকলো ভেন্দার আর উইলিয়াম।

'গুড মর্নিং, মিস মেয়ার।'

'গুড মর্নিং, বসুন।'

চোখ কপালে উঠেছে উইলিয়ামের। ট্রেসির গলায় লাল রিবন তো বটেই। তার সাথে আছে মগজ বিগড়ে দেয়া সৌন্দর্য।

'মিস মেয়ার, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু সবকিছু জানার পর আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আপনাকে কিছু সময় দিতেই হবে। আর আপনার অনুমতি ছাড়া আমরা কাজে নামতেও পারি না।'

'আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারছি না।'

'মিস মেয়ার, আপনি হয়তো আমাদের কথা শুনে আপসেট হতে পারেন, সেজন্যে আমরা দুঃখিত। কিন্তু সময় থাকতে সাবধান না হলে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সুনাম নিয়ে মানুষের মনে সন্দেহ জাগবে। আমরা একজন বিকৃত-রুচির ঠাণ্ডা-মাথার খুনীর সন্ধান পেয়েছি। এবং আমাদের সন্দেহ, সে খুনী কোনো না কোনো ভাবে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সঙ্গে জড়িত...'

'কি বলছেন?'

'হ্যাঁ, মিস মেয়ার। তাহলে শুনুন।'

উইলিয়াম ট্রেসিকে শোনালো লাল রিবন পরা মৃতা তরুণী আর স্নাফ ফিল্মের ঘটনাগুলো।

শুনে আঁতকে উঠলো ট্রেসি। এবং নিজের অজ্ঞাতেই ওর ডান হাতটা চলে

গেল রিবনের গিঁটে।

ব্যাপারটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে উইলিয়ামের। এবং যে প্রশ্নটা এতোক্ষণ ওর ভেতরে উসখুস করছিল, সেটা ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁটে উঠে এলো।

'মিস মেয়ার, প্রশ্নটা ব্যক্তিগত, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী, আপনি উত্তর দিলে আমার কাজে অনেক সাহায্য হবে। আমি অনুমান করছি, লাল রিবন পরতে আপনি ভালবাসেন। কিন্তু বিরন কি আপনি ছোটবেলা থেকেই পরেন?'

'না।'

'কবে থেকে পরছেন?'

'আমার একুশতম জন্মদিন থেকে।'

'কেন?'

'আমাকে একজন উপহার দিয়েছিল।'

'পুরষ না মহিলা?'

'পুরুষ।'

'তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?'

'বলতেই হবে?'

'আপনার আপত্তি থাকলে, থাক। কিন্তু তার পরিচয়?'

'হাসান জহির। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের চীফ এক্সিকিউটিভ। তাছাড়া অনারারী পরিচালক।'

'ধন্যবাদ। এখন আমার দুটো তথ্য দরকার। আপনাদের ফিল্ম ডিভিসন কার হাতে? আর মি. হাসানের গত এক বছরের অ্যাপয়েনমেন্ট ডায়েরী। আমার জানতে হবে কয়েকটা বিশেষ তারিখে তিনি কোথায় ছিলেন?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। আমাদের ফিল্ম ডিভিসন মি. হাসানের হাতে। কিন্তু ওই তারিখগুলো জানতে হলে ওর ডায়েরী দেখতে হবে। ওকে ডাকবো?'

'না। আপনি টেলিফোনে ম্যানেজ করতে পারলে ভালো হয়। আর একটা তথ্য দরকার। ফিল্ম ডিভিসনের স্টক থেকে জানতে হবে কখনো কোনো রিল চুরি হয়েছে কিনা।'

হাসানকে টেলিফোন করলো ট্রেসি।

রিসিভার নামাতেই উইলিয়াম আবার প্রশ্ন শুরু করলো।

'মিস মেয়ার, আপনাকে এখন থেকে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। আপনাকে ইতিমধ্যে একবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে।'

'খুন! কবে?'

'ষোলো তারিখের ভোরে। এক্সপ্রেস লিফটে।'

'না।'

'হ্যাঁ, মিস মেয়ার। ওটা দুর্ঘটনা নয়। পূর্বপরিকল্পিত। এখন বলুন, আপনার চোখে গত এক বছরে আর কোনো বেখাপ্পা ব্যাপার ধরা পড়েছে।'

চুপ করে আছে ট্রেসি। কথা বলছে না। ইতস্তত করছে, মন্ট ব্লঙ্ক আর সার্ডিনার কথা বলবে কিনা।

'মিস মেয়ার, জানি না, আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। খুনীর যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কিছু জানা থাকলে বলুন। না হলে দেরি হয়ে যেতে পারে।'

মন্ট ব্লঙ্ক আর সার্ডিনার কথা বললো ট্রেসি।

'মাই গড,' বললো উইলিয়াম। 'মিস মেয়ার, আমি নিশ্চিত, মন্ট ব্লঙ্কে ডেভিড মেয়ারকে খুন করা হয়েছে। সার্ডিনায়ও আপনাকে চেষ্টা করা হয়েছে। ওটা দুর্ঘটনা নয়।'

'কিন্তু...'

'আমরা মন্ট ব্লঙ্ক আর সার্ডিনায় যাবো।'

টেলিফোন বাজলো। হাসান করেছে।

গত বছর নভেম্বর সাত, ডিসেম্বর দশ, এবং এ বছর জানুয়ারী এক, জানুয়ারী পনেরো, সেপ্টেম্বর দশ, সেপ্টেম্বর আঠারো এবং সেপ্টেম্বর পঁচিশ—এ তারিখগুলোতে ও ছিলো বনে, জুরিখে, রোমে, প্যারিসে, নিসবনে, হামবুর্গে এবং লণ্ডনে।

'মাই গড!' শুনে আবার চমকে উঠলো উইলিয়াম। 'মিস মেয়ার, বুঝতে পারছেন ওই তারিখগুলোতে লাল রিবন পরা মেয়েগুলো খুন হয়েছে ওই সব শহরে।'

'কি বলছেন, মি. উইলিয়াম?' মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে ট্রেসির।

'হ্যাঁ, মিস মেয়ার। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি সাবধানে থাকবেন। আমি লণ্ডনে ফিরছি। সেখান থেকে মন্ট ব্লঙ্ক হয়ে সার্ডিনা যাবো। তারপর দেখা হচ্ছে। আপনার সঙ্গে ভেন্দার গাজ্ যোগাযোগ রাখবে। তাড়াতাড়ি ফিল্মের স্টক চেক করে তাকে জানাবেন। আচ্ছা, চলি। আবার বলছি, সাবধানে থাকবেন। হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর আমাদেরকে না জানিয়ে কোথাও যাবেন না। চলি। গুড বাই।'

লাল রিবন পরা রমণীরা গত বছর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে খুন হচ্ছে। কমপক্ষে সাতজন। সে সময় হাসান ওই শহরগুলোতে উপস্থিত ছিলো।··· না, এ কি শুনছে ট্রেসি? শেষ পর্যন্ত হাসান কি অভিযুক্ত হতে যাচ্ছে?··· না, কিছুই আর ভালো লাগছে না। ভাবা যাচ্ছে না।···

ইন্টারকমে হাসানকে ডাকলো ট্রেসি।

ঘরে ঢুকলো হাসান এবং ট্রেসির চেহারা দেখে চমকে উঠলো।

মুখ ফ্যাকাশে ট্রেসির। মনে হচ্ছে কে যেন ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।

'ট্রেসি, কি হলো? কোনো খারাপ খবর?'

'হাসান, আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না।'

'কি হয়েছে?'

'বলা নিষেধ। বাবা খুন হয়েছেন। তদন্ত চলছে। শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খোলা নিষেধ। তুমি কাল ফ্রি আছো?'

'কেন?'

'তার আগে বলো, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?'

'কেন?'

'বলো। সরাসরি বলো।'

'না।'

'তাহলে কাল আমাদের বিয়ে হচ্ছে।'

'এ সময়? তুমিই বললে তদন্ত চলছে।'

'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমারও একটা জীবন আছে।'

কাঁদতে আরম্ভ করলো ট্রেসি।

ওর মাথায় হাত রেখে হাসান বললো, 'ট্রেসি, কেঁদো না। আমি সত্যি তোমাকে ভালবাসি। আমি ভাগ্যবান। তোমার মতো এক উদার রমণীকে পেয়েছি।'

টেলিফোন বাজলো। জুলিয়া।

'মিস মেয়ার, মি. হাসান কি আপনার ঘরে? ফিল্ম ডিভিসনের অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর মি. আলেক তার সঙ্গে কথা বলবে।'

'হ্যাঁ। লাইন দাও। হাসান, তোমার টেলিফোন।'

'হ্যালো। মি. হাসান?'

'হ্যাঁ। কি খবর?'

'বস্, খবর ভালো না। স্টক চেক করে দেখছি, ফিল্মের সাতটা রিল নেই।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি।'

রিসিভার রেখে ট্রেসির দিকে তাকালো হাসান। মুহূর্তে অস্বাভাবিক হয়ে

উঠেছে ওর চোখমুখ।

চমকে উঠলো ট্রেসি। 'কি হলো, হাসান?'

'সাতটা ফিল্ম নেই। মাই গড!'

'হাসান, কিছু ভেবো না। আমি এখনি পুলিসকে জানাচ্ছি। আর তুমি আমাদের সিকিউরিটি বিভাগকে ব্যাপারটা তদন্ত করতে বলো।' মুখে কথাগুলো উচ্চারণ করতে গলা কাঁপলো না ট্রেসির। কিন্তু ভেতরে হু-হু করে কাঁদছে ও। সব শেষ। শেষ। অভিযুক্ত হতে যাচ্ছে হাসান।

উঠতে যাবে হাসান, এমন সময় আবার বাজলো টেলিফোন। জুলিয়া।

'মিস মেয়ার, প্লীজ একটু মি. হাসানকে দেন। ব্রাজিল থেকে একটা কল এসেছে।'

'হ্যালো। হাসান বলছি।'

'বস, লুইস। আপনাকে এক্ষুণি ব্রাজিলে আসতে হবে।'

'কেন?'

'প্লান্ট ম্যানেজার রবার্তো পদত্যাগ করেছে। ও আর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সে চাকরি করবে না।'

'না। না। রবার্তোকে ছাড়া যাবে না। আমি আসছি।'

রিসিভার রেখে গম্ভীর হয়ে গেল হাসান।

'কি হলো, হাসান?'

'ব্রাজিল যেতে হচ্ছে।'

'কখন?'

'এখনি।'

'কখন ফিরবে?'

'বলতে পারছি না। ব্যাপারটায় ঘাপলা আছে। তুমি চিন্তা করো না। আমি খবর দেবো।'

চলে গেল হাসান।

কিন্তু এবার যাবার আগে বিদায় জানালো।

চোদ্দ

রাত বারোটা।

বিছানায় ছটফট করছে ট্রেসি। ঘুম আসছে না। মাথা ধরে আছে। একটা ভোঁতা ব্যথা কোনকিছু ভালমতো চিন্তাও করতে দিচ্ছে না। চিন্তাগুলো জড়ো হয়ে আছে একটা মাত্র প্রসঙ্গে।…লাল রিবন। পৃথিবীর দিকে দিকে মরছে লাল রিবন পরা সুন্দরী রমণীরা। প্রতিটি মৃত্যুর দিন হাসান উপস্থিত ছিলো সে শহরে।…দুটো স্নাফ ফিল্ম পাওয়া গেছে। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স নিজের ব্যবহারের জন্যে তৈরি করে ওইসব ফিল্ম। হাসান ফিল্ম ডিভিসনের পরিচালক। সাতটা রিল খোয়া গেছে।…মন্ট ব্লঙ্কে খুন করা হয়েছে ডেভিড মেয়ারকে। সে রাতে ওখানে ছিলো হাসান।…সার্ডিনায় জীপের ব্রেকে কারচুপি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ওকে। সেদিন সেখানে হাসানের আসার কথা। অথচ আসেনি। ভেনিসে প্রেমিকার স্বপ্নে রাত কাটিয়েছে। কথাটা সত্যি?…এক্সপ্রেস লিফটের সেফটি ব্রেক কাজ করেনি। লিফটে ওর থাকার কথা। সোফিয়া ওকে বাসায় না পেয়ে অফিসে

টেলিফোন করে। না হলে? তার দুঘন্টা আগে অফিস ছেড়ে প্যারিস যায় হাসান। পূর্ব পরিকল্পিত? ...

না। এভাবে শুয়ে থাকলে সারা রাতেও ঘুম আসবে না। আর জেগে থাকলে ওকে কুরেকুরে খাবে ওইসব উদ্ভট চিন্তা। কিন্তু এসব হীন চিন্তায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে কি লাভ? খুনী যে-ই হোক না কেন, বাকি জীবনে হাসান ওর প্রেমিক থাকবেই। তাহলে?

ঘুম দরকার। তার ভেতরে স্বপ্ন। ভালবাসা। হায় ভালবাসা!

উঠে ঘুমের বড়ি খেয়ে চোখ বন্ধ করলো টেসি।

ভোর চারটা।

ল্যাবরেটরীতে রাত জেগে কাজ করছে আইভো মরতেল। আশা করছে, আজকেই কাজ শেষ হবে ওর।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো গার্ড পন্টি। আজ ওর নাইট ডিউটি। রাতের শিফটে কাজ করতে একদম ভালো লাগে না ওর। বিশেষ করে মরতেলের ল্যাবরেটরীতে। খাঁচায় বন্দী মুমূর্ষু প্রাণীগুলোকে দেখলে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও। একটা ভয় জাগে মনের ভেতর। যদি কোনোদিন এখানে মরে যাওয়া প্রাণীগুলোর আত্মারা ফিরে এসে আক্রমণ করে ওকে?

'গুড মর্নিং, স্যার।'

মাথা তুললো মরতেল। চোখে বিরক্তি।

'স্যার, আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন?'

'কেন?'

'গলাটা শুকিয়ে গেছে। আপনি অনুমতি দিলে সামনের বার-টা থেকে এক ঢোক গিলে আসতাম। আপনার কিছু লাগবে?'

'শুধু কফি।'

'ধন্যবাদ, স্যার। যাওয়ার সময় বাইরের দরজায় তালা লাগাবো। বেশি দেরি হবে না।'

ততক্ষণে মাথা নামিয়েছে মরতেল। পন্টির কথা কানেও ঢোকেনি ওর।

দশ মিনিট পর, আবার দরজা খুলে গেল।

একটা কণ্ঠ বললো, 'মরতেল, এখনো কাজ করছো?'

চোখ তুললো মরতেল। এবং দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে ও।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো মরতেল। 'হ্যাঁ, স্যার।'

'তা যৌবনের কি খবর? এটা তো আবার অত্যন্ত গোপনীয় প্রকল্প, তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার। অত্যন্ত গোপনীয়।'

'ভালো। ঠিক আছে, তাই থাক। তা কাজের অগ্রগতি কেমন?'

'অপূর্ব, স্যার।'

হাঁটতে হাঁটতে একটা খাঁচার সামনে দাঁড়ালো আগন্তুক।

পিছনে পিছনে এসেছে মরতেল। 'স্যার, কিছু ব্যাখ্যা করবো?'

হাসলো আগন্তুক। 'ধন্যবাদ। না। আমি কিছুটা জানি।'

পাশের খাঁচায় যাবার জন্যে পা বাড়ালো আগন্তুক। যাবার সময় তার গায়ে লেগে উল্টে পড়লো খাঁচার সামনে রাখা খাবার প্লেটটা। 'দুঃখিত, মরতেল।'

'ঠিক আছে, স্যার। আমি তুলছি।'

প্লেটটা তোলার জন্যে বসে পড়ে মাথা সামনে নামালো মরতেল।

কিন্তু ওর মনে হলো ঘাড় থেকে মাথার পিছনটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যাচ্ছে। চোখের সামনে শুধু রক্ত আর রক্ত। মেঝেটা দ্রুত গতিতে উঠে আসছে ওর দিকে।...

টেলিফোনের চিৎকারে ঘুম ভাঙলো ট্রেসির। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, ভোর পাঁচটা। ঘুমে ভারি হয়ে আছে চোখ। এতো সকালে কে? হাসান?

অবশ হাতে টেলিফোন তুললো ট্রেসি।

'মিস মেয়ার?' একটা ভীত কণ্ঠের আওয়াজ। 'আমি সিকিউরিটি পার্ট। আমাদের একটা ল্যাবরেটরীতে বিস্ফোরণ হয়েছে। ল্যাবরেটরীর কোনো অস্তিত্ব নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছুটে গেছে টেসির চোখ থেকে। 'কেউ আহত?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। একজন বিজ্ঞানী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তার নাম…'

'বলতে হবে না।' রিসিভার নামিয়ে রাখলো টেসি। ও জানে, কে মারা গেছে।

সকাল সাতটা। টেসির অফিসরুম।

'সবকিছু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটেছে, মিস মেয়ার। আমাদের করার কিছু ছিলো না। আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে নামার আগেই জ্বলে গেছে ল্যাবরেটরী।' কথা শেষ করলো মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের সিকিউরিটি প্রধান।

'কিন্তু ওই বিল্ডিংয়ে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা থাকার কথা। তাই না?' প্রশ্ন করলো টেসি।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। আমরা…'

'তুমি কতদিন থেকে চাকরি করছো?'

'পাঁচ বছর। আমি…'

'তোমাকে এই মুহূর্তেই বরখাস্ত করা হচ্ছে।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো সিকিউরিটি প্রধান। কিন্তু শেষে মন বদলালো। 'ঠিক আছে, ম্যাডাম।'

'তোমার ডিপার্টমেন্টে কতজন চাকরি করে?'

'সত্তর জন।'

সত্তর জন! এতোগুলো মানুষ একজন মরতেলকে বাঁচাতে পারলো না। 'আমি ওদেরকে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দিচ্ছি। সবাই চলে যাও।'

'মিস মেয়ার, এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'বেরিয়ে যাও।' চিৎকার করে উঠলো টেসি।

মরতেল। কী বীভৎস দেখাচ্ছিল ওকে! অথচ ওর হাতেই [illegible] সুন্দর সম্ভাবনা। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করার রঙিন স্বপ্ন। সব শেষ। মরতেলের মৃত্যুর [illegible] পুড়ে ছাই হয়ে গেছে টেসির।

জ্বলে উঠলো ইন্টারকমের আলো। জুলিয়া। [illegible]

'ইয়েস।'

'বস, দুনম্বর লাইনে মি. ওয়ালথার অপেক্ষা করছেন। [illegible]'

'দাও।' রিসিভার তুললো টেসি।

'গুড মর্নিং, মিস মেয়ার।' শুকনো গলা ব্যাংকারের। 'আপনি দুপুরে [illegible] আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। দুটোর সময় অসুবিধে হবে না তো?'

'না। বেলা দু'টো।'

কাজে মন ডোবালো টেসি। মন খালি থাকলেই বারে বারে ভেসে উঠছে মরতেলের বীভৎস শরীর। আর মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। 'কিন্তু হাসান কোথায়? খবর দিচ্ছে না কেন?

বেলা ঠিক দুটোয় নিজের কাঠির মতো শরীরটাকে চেয়ারে বসিয়ে কোনো ভূমিকা ছাড়াই ওয়ালথার বললো, 'মিস মেয়ার, আমি আপনার সমস্যাটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এতদিন বিবেচনা করেছি; কিন্তু আপনি জানেন, আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের মতামতকে আমাদের সবসময় প্রাধান্য দিতে হয়।'

এ ধরনের কথা ব্যাংকাররা বিধবা কিংবা এতিমদের বন্ধক দেয়া সম্পত্তি ক্রোক করার সময় বলে। কিন্তু হঠাৎ ওয়ালথার আমাকে এ কথা বলছে কেন, ভাবলো টেসি। ওকে তো নব্বই দিন সময় দেয়া হয়েছিল। এখন ওর মন বদলাচ্ছে কেন? তবে পরিস্থিতি যাই হোক, সবকিছু মোকাবেলা করার জন্য

ট্রেসি আজ প্রস্তুত। ওর আর হারানোর কিছু নেই।

'মি. ওয়ালথার, আমাকে তিনমাস সময় দেয়া হয়েছে।' কোনো সৌজন্য না দেখিয়ে বললো ট্রেসি।

'দুঃখিত, মিস মেয়ার। পরিস্থিতি সবকিছু পাল্টে ফেলেছে। আইভো মরতেলের মৃত্যুতে হতাশ হয়ে পড়েছে আমার শেয়ারহোল্ডাররা। ওরা আমাকে চাপ দিচ্ছে। আপনার অবগতির জন্যে আরো জানাচ্ছি, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের অন্য ব্যাংকগুলোও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।'

আইভো মরতেলের মৃত্যু! সে কথা কেমন করে জেনেছে ওয়ালথার? চমকে উঠলো ট্রেসি। খবরের কাগজে শুধু ল্যাবরেটরী ধ্বংসের খবরই ছাপানো হয়েছে। মরতেলের নাম তো দেয়া হয়নি। তাহলে কি মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। এখানে খুন হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, স্যাবোটেজ হচ্ছে, কথা ফাঁস হচ্ছে। এটা কি জঙ্গল? শক্ত হয়ে গেল ট্রেসির চোয়াল।

'মি. ওয়ালথার, আপনি জানেন, মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স এখনো একটা শক্তিশালী কোম্পানী।'

'অবশ্যই, মিস মেয়ার। একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান।'

'তাহলে? তবু আপনারা আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দেবেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওয়ালথার বললো, 'আমরা সবাই মিলে ইণ্ডাস্ট্রির সমস্যাটা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, এখনো এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু ...'

'কিন্তু সে কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, এই তো?'

'দুঃখিত, মিস মেয়ার। আপনার কথা সত্যি। এবং মেয়ার পরিবারের বর্তমান পরিচালকদের কারো ভেতরেই সে গুণ নেই।'

'না। আমি অন্য একজনের কথা ভাবছি।'

'কে?'

'মি. হাসান জহির।'

'তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাই হবে।'

'কিন্তু তিনি তো নিয়ম অনুযায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে পারেন না।'

'ও আমার স্বামী হতে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। কনগ্রাচুলেশন।'

মিসেস হাসান জহির!

বাক্যটা ব্যঙ্গ করছে ট্রেসিকে। একুশতম জন্মদিনে লেখা ডায়েরীর পাতাটা বন্ধ করলো ও।

কোনো সন্দেহ নেই, সব ঘটনার নায়ক হাসান। নিখুঁত পরিকল্পনায় সবকিছু সাজিয়েছে ও। আশ্চর্য, এক কথায় ওকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বানানোর প্রস্তাবে রাজি হলো ওয়ালথার! অথচ ওদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বাকি পড়ে আছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সে। মেধাবী পরিচালক হাসান জহির! ডেভিড মেয়ারও সে কথা বিশ্বাস করতেন। অথচ হাসান জহির জানতো না তার ডিপার্টমেন্টে আধ ডজন ফিল্ম চুরি হয়েছে। নাকি অভিনয়?

হাসানের সবকিছুই অভিনয়। মন্ট ব্লঙ্কের বাবার মৃত্যু ওর কাছে দুর্ঘটনা। সার্ডিনার ঘটনাও দুর্ঘটনা। আর লিফটের ব্যাপারটা নিয়ে একটা কথাও বলেনি। আর মরতেলের মৃত্যু? সেটাও দুর্ঘটনা?

অভিনয়। সব অভিনয়।

হাসান কি এখন ব্রাজিলে? প্রতিটি ঘটনার সময় একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে অকুস্থল থেকে সরে গেছে ও। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হলো, এখনো কোনো খবর দিলো না। কেন?

কিন্তু হাসান কি ওকে খুন করবে? পারবে? অবশ্যই পারবে। না হলে লাল রিবন পরা রমণীরা খুন হচ্ছে কেন?

হঠাৎ আতঙ্ক আঁকড়ে ধরলো ট্রেসিকে। মনে হচ্ছে, ব্রাজিলে নয়, এখানেই কোথাও ওত পেতে আছে হাসান। খুন করবে ওকে। এবং ও ওই স্লাফ ফিল্মগুলোর লাল রিবন পরা নায়িকা। মৃত্যুর আগে ধর্ষণ করা হবে ওকে।

একা ঘরে থাকতে গা ছমছম করছে ট্রেসির। না, এখানে থাকা যাবে না। মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসেছে ওকে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো ট্রেসি। ডেস্ক পেরিয়ে সামনে পা বাড়াতেই ওর দৃষ্টি আটকা পড়লো বাশেভিস আর গোন্ডা মেয়ারের পোট্রেটে। আহ্, কতো জীবন্ত ওরা। কতো সুখী! চকচক করছে গোন্ডার গলায় লাল রিবন। ওই লাল রিবনের প্রেমেই পড়েছিল বাশেভিস। আর সে প্রেমেই জন্ম নিয়েছে মেয়ার অ্যাণ্ড সন্স। অথচ ওর লাল রিবন আজ সাপের ফণা। প্রেমের দুঃস্বপ্ন। বিভীষিক। মেয়ার অ্যাণ্ড সন্সের ধ্বংসের বীজ।

কিন্তু পোট্রেটটা বেঁকে আছে কেন? লিফট ব্রাশের সময় গোটা বিল্ডিং কেঁপেছে। তখনি কি ওটা বেঁকে গেছে?

পোট্রেটটা সোজা করার জন্যে হাত বাড়ালো ট্রেসি। কিন্তু ওটার গায়ে ওর হাত পড়তেই হুক থেকে খুলে মেঝেতে পড়ে গেল বাশেভিস আর গোন্ডা। মেঝেতে কাঁচ ভাঙার শব্দ হলো ঝনঝন।

কিন্তু সেদিকে কান গেল না ট্রেসির। ওর চোখের জন্যে অপেক্ষা করছিল বিস্ময়।

এ কি! দেয়ালে একটা ছোট্ট মাইক্রোফোন টেপ দিয়ে আটকানো।

ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে ওপরে উঠছে ট্রেসির। হ্যাঁ। গোপন কথা ফাঁস হবার কারণ বোঝা যাচ্ছে।

পালাতে হবে। না হলে ওকে খুন করে ফেলবে হাসান। নিশ্চয় আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে ও।

পা তুললো ট্রেসি।

কিন্তু চিৎকার করে বেজে উঠলো টেলিফোন।

কাঁপা-কাঁপা হাতে রিসিভার তুললো ট্রেসি।

'হ্যালো। ট্রেসি?' রিচার্ডের গলা।

'হ্যাঁ। রিচার্ড, হঠাৎ?'

'ট্রেসি, একটা খারাপ খবর আছে। তোমার ভাবী মারা গেছে।'

'অ্যা! কি হয়েছিল ডরিসের?'

'ঠিক জানি না। আমি হাউজ অভ কমন্সের এক বিতর্কে ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোন এলো, ডরিসের অবস্থা সিরিয়াস, তাড়াতাড়ি আমাকে বাসায় যেতে হবে। আমি গিয়ে দেখি, অ্যাম্বুলেন্সে ডরিসকে মর্গে নেয়া হচ্ছে।

'অ্যাম্বুলেন্সে উঠে দেখি মারা গেছে ডরিস। পাশে একজন ডাক্তার ছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছিল? অসহায়ের মতো উত্তর দিলো ডাক্তার, "ঠিক বলতে পারবো না, স্যার রিচার্ড। আমাকে একজন অপরিচিত লোক টেলিফোন করে জানায়, আপনার বাসায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি পৌঁছে দেখি, বেডরুমের মেঝেতে পড়ে আছে লেডি রিচার্ড। নগ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীর। হাঁটুর চাকা দুটো গজাল দিয়ে মেঝেতে গাঁথা। সমস্ত দেহে ধর্ষণের চিহ্ন।'

'ট্রেসি, আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি এ ঘটনা কে ঘটিয়েছে?'

'কে?'

'হাসান জহির।'

'না।'

'হ্যাঁ। ট্রেসি।'

'হাসান তো এখন ব্রাজিলে।'

'না। লণ্ডনে।'

'মানে?'

'শোনো। আমার বৌ বলে বলছি না, ডরিস ছিলো আসলেই ভালো মেয়ে। আমাকে ভীষণ ভালবাসতো ও। শুধু বেহিসেবীর মতো পয়সা খরচ করতো, এই যা।

'আজ থেকে কয়েক বছর আগে হাসান একবার আমার বাসায় বেড়াতে আসে। তখন ডরিসকে দেখে ওর প্রেমে পড়ে হাসান। তুমি তো জানো, হাসানের বাতিকের কথা। লাল রিবন দেখলে ও খেপে যায়।

'ছোটবেলায় হাসানের চোখের সামনে ওর তরুণী বড়বোনকে ধর্ষণ করে

কয়েকজন সৈনিক। ওর বড়বোন গলায় লাল রিবন পরতে ভালবাসতো। ধর্ষণের সময় ওর বড়বোনের গলায় লাল রিবন ছিলো। দৃশ্যটির আঘাত স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় বালক হাসানের অসচেতন মনে। এবং ওর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওই দৃশ্যটির প্রতিশোধ নেয়ার আকাঙক্ষায় গড়ে উঠতে থাকে ওর অবচেতন মন। এবং যখন ওর হাতে আসে ক্ষমতা আর অর্থ, তখন ও ওই দৃশ্যটির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে থাকে স্নাফ ফিল্মের মাধ্যমে।...'

'কিন্তু রিচার্ড, তুমি এসব কথা জানলে কোত্থেকে?'

'জানতাম না। কাল রাতে ডিটেকটিভ উইলিয়াম এসেছিল আমার কাছে। ও জানালো, সাতটি লাল বিরন পরা যুবতীর মৃত্যুর কথা, দুটো স্নাফ ফিল্ম; আমাদের স্টক থেকে ফিল্ম চুরি হয়েছে। উইলিয়াম হাসানকে সন্দেহ করছে। ও আমাকে বলেছিল ডরিসকে সাবধান করে দিতে। কিন্তু।

'যাক্। যা বলছিলাম। ডরিসের গলায় লাল রিবন দেখে ওকে টার্গেট করে হাসান। কিন্তু ওর প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয় না ডরিস। এভাবে তোমার ভাবীর ওপর জমতে থাকে হাসানের আক্রোশ।

'ট্রেসি, মাই সুইট সিস্টার, আপসেট হয়ো না। তোমার ভাবী মারা গেছে, তাকে আর পাবো না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমাকে আর লিজিকে নিয়ে।'

'লিজি? কি বলছো, রিচার্ড?'

'হ্যাঁ। লিজি আর হাসানের প্রেম অনেক পুরনো। আমি শুনেছি, সপ্তাহে কমপক্ষে দুবার দেখা করে ওরা। এবং চরম মুহূর্তগুলোতে গলায় লাল রিবন পরে লিজি। আরো শুনেছি, লিজির অনেক প্রেমপত্র জমা আছে হাসানের ডেস্কে।

'ট্রেসি, দুঃখ পেয়ো না। আমার ধারণা, তুমি হাসানের প্রেমে পড়েছো। তোমার গলার লাল রিবনই তার সাক্ষী। ভুল মানুষ করে। আমার অনুরোধ, তুমি সবকিছু ভালভাবে ভেবে দেখবে। হাসান খুনী। দু-একদিনের মধ্যেই উইলিয়াম সব ক্লু পেয়ে যাবে। সাবধানে থেকো। গুড বাই।'

কেটে গেল টেলিফোনের সংযোগ।

কিন্তু ট্রেসির মনে হলো জীবনের সংযোগই কেটে গেছে ওর।

হাসান খুনী···লিজির অনেক প্রেমপত্র জমা আছে হাসানের ডেস্কে···

না। সব মিথ্যে।···

হাসান খুনী নয়।···

হাসান আমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না।···

টালমাটাল পায়ে ট্রেসি ঢুকলো হাসানের অফিস রুমে।

ঘর অন্ধকার।

আলো জ্বালিয়ে চারদিকে তাকালো ট্রেসি। কিন্তু দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা। কেন এখানে এসেছে ও? কি খুঁজছে ও? নিজের সঙ্গে তর্ক করলো ট্রেসি। না, হাসানের অপরাধের প্রমাণ খুঁজতে এখানে আসেনি ও; হাসান নির্দোষ, নিষ্পাপ; ও খুঁজতে এসেছে হাসানের সরলতার প্রমাণ। কেমন করে প্রেমিকা বিশ্বাস করতে পারে তার প্রেমিক বিকৃত রুচির পুরুষ, একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনী?

হাসানের ডেস্কের ওপরের সবগুলো ড্রয়ার খোলা, শুধু নিচেরটা বন্ধ।

ওপরের ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে দেখলো ট্রেসি। সবখানে অফিসিয়াল কাগজপত্র, নোট, স্মারক। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ট্রেসির। আবার ভালো লাগছে সবকিছু।

এখন শুধু নিচের ড্রয়ারটা খোলা বাকি। কিন্তু ওটা তো তালাবন্ধ।

দ্বিধা জাগছে ট্রেসির ভেতর। ওটা খোলার কোনো অধিকার নেই ওর। এটা বিশ্বাসের অমর্যাদা। এক নিষিদ্ধ সীমানায় অনধিকার প্রবেশ। প্রেমিক-প্রেমিকা তা করতে পারে না। হাসান একদিন জানতে পারবে, কে এ কাজ করেছে। ট্রেসিকে বলতে হবে, কেন ও এ কাজ করেছে। তখন?

কিন্তু তবু ট্রেসিকে নিজ চোখে দেখতে হবে, হাসান নিরীহ। দেখতেই হবে।

ডেস্কের ওপর থেকে খাম খোলার চাকুটা নিয়ে তালা ভেঙে ফেললো ট্রেসি। ঝরে পড়লো কাঠের গুঁড়ো।

ড্রয়ার টান দিতেই প্রথমে চোখে পড়লো একটা খাম। হাসানের ঠিকানা। ভেতরে একটা চিঠি। হাতের লেখাগুলো মেয়েলী।···'প্রিয়, কি ব্যাপার? কোথায়

থাকো? টেলিফোন করে করে পাচ্ছি না। বারো তারিখ রাতে আসবে কিন্তু। খুব জরুরী। আমাদের পরিকল্পনাটা পাকা করতে হয়।…লিজি।' কিন্তু তার চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে ড্রয়ারে।

খামের নিচেই পড়ে আছে সার্ডিনা ভিলায় গোয়েন্দা দলের হারানো সেই রিপোর্ট।

১.৯.০০০

মিঃ ডেভিড মেয়ার

গোপনীয়

কোনো কপি নেই

থমকে গেছে মুহূর্ত, পৃথিবী। চোখের সামনে দুলতে আরম্ভ করেছে ঘরটা। শক্ত করে ডেস্কের কোণাটা চেপে ধরলো ট্রেসি। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। অপেক্ষা করছে কখন কাটবে মাথার ঝিমঝিমানিটা। এতদিনের অদৃশ্য খুনীর মুখটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ট্রেসি। সে মুখ হাসানের। ওর প্রেমিকের, ওর স্বামীর।

একটা শব্দ হচ্ছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে সে শব্দ।…

বুঝতে অনেক সময় গেল ট্রেসির, শব্দটা ওর ঘর থেকে আসছে।

ফোন।

'হ্যালো। ট্রেসি।' হাসানের গলা।

'…'

"কি হলো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'আমি লণ্ডন থেকে বলছি। ডিটেকটিভ উইলিয়াম ব্রাজিল থেকে ফেরার সময় লণ্ডনে আসতে বলেছিল। এসে দেখি, সে বাইরে গেছে কি এক তদন্তে। আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।…তুমি কথা বলছো না কেন? রাগ করেছো? লক্ষ্মীটি শোনো, ব্রাজিলে খুব বাজে সময় গেছে। ওগুলো বলে তোমার দুশ্চিন্তা

দাঁড়াতে চাইনি। মরতেলের জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছে। ছেলেটা ব্রিলিয়ান্ট ছিলো। কি হলো, কথা বলছো না কেন?'

'...'

'ট্রেসি। তোমার শরীর খারাপ?'

'...'

'আমার ওপর এতো রাগ করো না, প্লীজ।'

'ঠিক আছে। আমি এখনি আসছি।'

ট্রেসির হাত থেকে ছিটকে পড়লো রিসিভার। হাসানের শেষ বাক্যটি ও শুনেছে. 'আমি এখনি তোমাকে খুন করতে আসছি।' ...রিচার্ডের কথা সত্যি। হাসান এখন লণ্ডনে। ডরিসকে খুন করেছে ও।...পালাতে হবে।...কিন্তু কোথায়?...পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে হাসান খুন করেনি লাল রিবন পরা রমণীকে।...তবু পালাতে হবে।...পাসপোর্ট।...

ডেস্ক থেকে পাসপোর্ট নিয়ে বেরুতে যাবে ট্রেসি, এমন সময় জ্বলে উঠলো ইন্টারকমের আলো।

অ্যালিয়া। 'বস্, চার নম্বর লাইনে সার্ডিনা থেকে ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। দেবো?'

'বোনাসেরা, সিনোরিনা ট্রেসি।'

'বোনাসেরা, পাওলো।'

'সিনোরিনা, আমরা আপনার দুর্ঘটনার সেই জীপটা খুঁজে পেয়েছি এক জঙ্গলে।'

'মানে?'

'আপনি যেটা আমাদের গ্যারেজে দেখেছেন সেটা আপনার জীপ ছিলো না। কেউ কারচুপি করেছে। মেকানিক ব্যাটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি সার্ডিনায় চলে আসুন। যে জীপটা আমরা জঙ্গলে পেয়েছি সেটা আপনার কিনা, আপনাকে সনাক্ত করতে হবে।'

'আমি এখনি আসছি।'

'গ্রাসিয়া।'

'প্রেগো।'

যাক্। বাঁচা গেল। পালাবার একটা পথ পাওয়া গেছে।

পনেরো

সিভিত্তাভেচ্চিয়া উপকূল থেকে সার্ডিনা উপকূলে যাত্রী আর গাড়ি পৌঁছে দেয় একটা ফেরিবোট। একটা ভাড়াকরা মোটরগাড়ি নিয়ে সেই ফেরিবোটে করে সার্ডিনার অলভিয়া ঘাটে নামলো ট্রেসি। তাড়াহুড়ো করে পালাবার শেষ মুহূর্তে ওর মনে পড়েছে ডিটেকটিভ উইলিয়ামের সতর্কবাণীঃ 'আমাদের না জানিয়ে কোথাও যাবেন না।' টেলিফোনে ভেন্দার গাজকে ধরার চেষ্টা করে ও, কিন্তু পায়নি; শেষে একটা মেসেজ রেখে এসেছে।

ঘাটে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তা নিজে। ওকে দেখে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো ট্রেসির মন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও।

ট্রেসির ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে পাওলো বাস্তা বললো, 'সিনোরিনা, বাকি পথটা আমি গাড়ি চালাই?'

'গ্রাসিয়া।'

দরজা খুলে পিছনের সীটে বসলো ট্রেসি। আর ড্রাইভারের আসনে নিজের লম্বা শরীরটাকে বসালো পাওলো।

'সিনোরিনা, রাত হয়ে গেছে। আপনার জীপটা যে জঙ্গলে আছে, সেটা দুর্গম পথ। আজ আর ওখানে যাচ্ছি না। কাল ভোরে রওনা হবো। আপনি রাতটা কোথায় কাটাবেন? পুলিস স্টেশনে, না আপনার ভিলায়?'

'ভিলায়। যদি কেউ সঙ্গে থাকে। আমি···আমি একা থাকতে চাই না।'

'এতো চিন্তা করবেন না। আপনাকে নিরাপদে রাখার সব বন্দোবস্তই করা হয়েছে। আমি নিজে ভিলায় থাকবো। আপনার ভিলার প্রবেশ পথে পুলিসের একটা রেডিও-কার থাকবে। আপনার চুল স্পর্শ করার সাধ্যও কারো নেই।'

পাওলোর বন্দোবস্ত যে কাউকে আশ্বস্ত করার জন্যে যথেষ্ট।

সত্যি নিরাপদ বোধ করছে ট্রেসি। পিছনের নরম গদিতে হেলান দিলো ও।

দক্ষ হাতে গাড়ি চালাচ্ছে ডিকেটটিভ পাওলো।

চলায় যথেষ্ট গতি আছে। অলভিয়ার ছোটো ছোটো পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে বাতাস কেটে কেটে দ্রুত বেগে ম্বেরান্ডা উপকূলের দিকে উঠে যাচ্ছে গাড়ি।

হ্যাঁ। এখন নিরাপদ ট্রেসি। অকস্মাৎ মৃত্যুর ভয় আর নেই। মন অনেক শান্ত। সবকিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছে আবার।

হাসান এখন কোথায়? ও কি ওর টেলিফোনের কথা মতো লণ্ডন থেকে জুরিখে এসেছে? তারপর? ট্রেসিকে না পেয়ে কি করেছে ও? শেষ পর্যন্ত ট্রেসিকে কোথাও না পেয়ে কোথায় গেছে ও? পুলিস স্টেশনে? কিন্তু পুলিস স্টেশন তো হাসানের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় নয়। নিশ্চয় ডিটেকটিভ উইলিয়াম এতক্ষণে ডরিসের মৃত্যুর কথা জেনেছে। তাহলে? হাসান কি এখন জেলে, না পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিসের ভয়ে? যেমন ট্রেসি নিজে পালিয়ে বেড়াচ্ছে হাসানের ভয়ে। এটা তো ট্রেসির জন্যে আনন্দের কথা। ওর হত্যাকারী হয় জেলে আর নয়তো নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ও নিজে এখন নিরাপদ।

কিন্তু এ কি? চোখ ভেজা ভেজা লাগছে কেন ট্রেসির? কিসের জন্যে আক্ষেপ করছে ও?

রিয়ার ভিউ-এ ডিটেকটিভ পাওলো দেখলো, চোখ হাত দিয়ে ঢেকে থরথর করে কাঁপছে ট্রেসি। গাড়ির গতি কমিয়ে ও ডাকলো, 'সিনোরিনা, শীত করছে?'

'না। আমি ঠিক আছি।'

নিজস্ব গতিতে আবার চলতে আরম্ভ করলো গাড়ি।

কিছুদূর যাওয়ার পর শরীরে জ্বর-জ্বর অনুভব করলো ট্রেসি। উত্তপ্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে ঢুকছে গাড়ির খোলা জনালা দিয়ে। আগুনের মতো জ্বলছে গা।

প্রথমে ট্রেসি ভাবলো, উল্টোপাল্টা চিন্তার কারণে ভুল দেখছে এবং ভুল অনুভব করছে ও। কিন্তু গাড়ি থামিয়ে পাওলো বললো, 'মিস মেয়ার, আমার মনে হয় সিরক্কো শুরু হচ্ছে। আজ একটা বিশ্রী রাত যাবে।'

ট্রেসি বুঝতে পারছে পাওলোর কথার অর্থ। সিরক্কোর নাম শুনেছে ও। সিরক্কো হচ্ছে উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ ইটালিতে প্রবাহিত তপ্ত-শুষ্ক-ধূলিপূর্ণ প্রবল ঘূর্ণিবাতাস। এর উত্তাপে খেপা হয়ে যায় সব বয়সের নারী পুরুষ। এবং ওই সময়টাতে যৌন মিলনের অপরাধ বেড়ে যায়। এবং বিচারকরা সেদিনের অপরাধীদের ক্ষমার চোখে বিচার করে।

পথে কেটে গেল এক ঘন্টা।

এক ঘন্টা পর, অন্ধকারের সম্রাজ্যের ভেতর ট্রেসির চোখের সামনে ভেসে উঠলো সার্ডিনা ভিলা। ডিটেকটিভ পাওলো গতি নিয়ন্ত্রণ করে গাড়ি ঢোকালো কারপোর্টের ভেতরে।

থেমে পড়লো এঞ্জিন।

গড়ি থেকে নেমে ট্রেসির দরজা খুললো পাওলো।

'সিনোরিনা, আমার ইচ্ছে আপনি আমার পেছনে থাকুন। এটা এমন কিছু না, তবু।'

'ধন্যবাদ।'

আঁধারের ভেতর, মন্থর পায়ে ডিটেকটিভ পাওলোর পিছনে পিছনে সার্ডিনা ভিলার সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ট্রেসি।

'ভিলার মধ্যে কারো থাকার প্রশ্নই ওঠে না, মিস ট্রেসি। কিন্তু আমি কোনো

ঝুঁকি নিতে রাজি নই। অনুগ্রহ করে ভিলার চাবিটা দেবেন?'

পার্স থেকে বের করে ভিলার চাবি পাওলোর হাতে তুলে দিলো ট্রেসি। ওকে পিছনে রেখে তালার ভেতর চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুললো পাওলো। অন্য হাতে উঁচিয়ে আছে রিভলভার।

ট্রেসিকে দরজার বাইরে রেখে ঘরের ভেতরে একা ঢুকে সুইচ টিপলো পাওলো। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠলো হলঘর।

হলঘরের সমস্ত প্রান্ত ভালো করে দেখে নিয়ে ট্রেসিকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিয়ে পাওলো বললো, 'মিস মেয়ার, আপনি আমাকে প্রতিটি ঘর দেখতে দিলে আমি নিশ্চিত হতাম।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

প্রতিটি ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এগোলো ওরা। একটা একটা করে সবগুলো বাতি জ্বলে উঠলো সার্ডিনা ভিলার।

সব দেখে নিচের লিভিং-রুমে ফিরে এলো ট্রেসি আর পাওলো।

পাওলো বললো, 'সিনোরিনা, আপনি কিছু মনে না করলে আমি আমার হেডকোয়ার্টারে খবর দিতে চাই।'

'অবশ্যই।'

পাওলোকে নিয়ে স্টাডি-রুমে ঢুকলো ট্রেসি।

রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালো পাওলো বাস্তা।

'হ্যালো। ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তা বলছি। আমরা এখন ভিলায়। আমি আজ এখানেই ক্যাম্প করছি। তাড়াতাড়ি রেডিও-কার পাঠান।' কয়েক মুহূর্ত কথা শুনলো পাওলো, তারপর বললো, 'হ্যাঁ। সিনোরিনা ভালোই আছে। একটু ক্লান্ত, এই যা। পরে যোগাযোগ করবো। রাখি। বোনানোতে। অ্যা! কি বললেন? মি. হাসানকে পুলিস খুঁজছে? সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

সোফায় বসে পড়লো ট্রেসি। ভেতরে ভেতরে অনুভব করছে, চাপা উত্তেজনা আর অবসাদ। তবে আজ রাতের চেয়েও আগামীকাল ওর অবস্থা আরো খারাপ

হবে, এটা ভালভাবে বুঝতে পারছে। শুধু খারাপ নয়, জঘন্য। কাল থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও; কিন্তু তখন হাসান হয় মৃত আর নয়তো কারাগারে। দুটো সংবাদের একটাও সহ্য করতে পারবে না ট্রেসি। কেমন করে পারবে?

মনোযোগ দিয়ে ট্রেসিকে দেখছে পাওলো। যেন পড়তে পারছে মনের কথা। উদ্বেগ জাগলো ওর মুখে।

'সিনোরিনা, আমার এখন এক কাপ কফিতে চুমুক দিতে ইচ্ছে করছে,' বললো পাওলো, 'আপনার খবর কি?'

মাথা দোলালো ট্রেসি। 'এক মিনিট। আমি বানিয়ে আনছি।' সোফা ছেড়ে উঠলো ও।

'না। না। আপনি বসুন। আমার বৌ বলে, আমার হাতের কফি নাকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ।'

অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফোটালো ট্রেসি। 'ধন্যবাদ।' আবার সোফায় বসে পড়লো ও।

ট্রেসি এখন বুঝে গেছে, পৃথিবীতে হঠাৎ করে একটু আগে সত্যি সত্যি নিঃস্ব হয়ে গেছে ও। রিচার্ডের টেলিফোন পাওয়ার পর থেকে সার্ডিনা ভিলায় ঢোকা পর্যন্ত ওর মনে একটা আশার নিবুনিবু দীপ বেঁচে ছিলো—হাসান নির্দোষ। কোথাও কোনো একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। কারণটা কেউ জানে না। কিন্তু হাসান নিষ্পাপ। হাসান ওইসব জঘন্য কাজ করতে পারে না। পারে না ওর বাবাকে খুন করতে। পারে না ভালবাসার অভিনয় করে ট্রেসিকে মৃত্যুর গুহায় ঠেলে দিতে। শুধু একজন দানবের পক্ষেই ওইসব কাজ করা সম্ভব। কিন্তু ট্রেসির সেই ক্ষীণ আশা মরে গেছে যখন ও শুনলো টেলিফোনে পাওলো বলছে, 'মি. হাসানকে পুলিস খুঁজছে। সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'...

কাঁদতে আরম্ভ করলো ট্রেসি।

'সিনোরিনা...,' কফির কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে পাওলো বাস্তা। 'কফিটা খেয়ে ফেলুন, দেখবেন ভালো লাগছে।'

'আমি...আমি দুঃখিত, সিনর পাওলো,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো

ট্রেসি, 'আমি এতো টেনসন সহ্য করতে পারি না।'

'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, সিনোরিনা? আপনি সবকিছু ভালোভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব ভালো। ইটালিয়ানরা একে বলে মন্তে বেনে।'

গরম কফিতে চুমুক দিলো ট্রেসি। কিন্তু কফিতে কি যেন আছে? পাওলোর চোখের দিকে তাকালো ও। হেসে পাওলো বললো, 'ভাবলাম, আপনি ক্লান্ত। এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি হয়তো কাজে আসবে।'

সামনের সোফায় বসলো পাওলো। কোনো কথা বলছে না ও। নীরবে সঙ্গ দিচ্ছে ট্রেসিকে। ওর কাছে কৃতজ্ঞ ট্রেসি। এখানে এখন একা থাকতে পারতো না ও। চুমুক দিয়ে দিয়ে কফি শেষ করলো ট্রেসি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তা বললো, 'যে কোনো মুহূর্তে পুলিসের পেট্রল কার চলে আসবে। সারারাত পাঁচজন গার্ড থাকবে। আমি নিচতলায় যাচ্ছি। আপনি বিছানায় যান। ঘুমোবার চেষ্টা করুন।'

'আমি ঘুমোতে পারবো না,' ধরা গলায় বললো ট্রেসি। কিন্তু তখনি ও অনুভব করলো ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। অবসাদে জড়িয়ে আসছে শরীর। হয়তো সারাদিনের জার্নি এবং মানসিক উত্তেজনা এখন প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে।

'তাহলে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নি,' বললো ও। কিন্তু ও দেখলো কথাগুলো ওর মুখ দিয়ে বেরুতেই চাইছে না।

বিছানায় শুয়ে আছে ট্রেসি। যুদ্ধ করছে ঘুমের বিরুদ্ধে। ওর মন বলছে, ঘটনা যাই হোক, সত্য যাই হোক, হাসান যখন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, ওর এখন ঘুমোনো উচিত নয়। হঠাৎ ও দেখতে পেলো, একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার রাস্তায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে হাসান। একা। নিঃসঙ্গ।

থরথর করে কেঁপে উঠলো ট্রেসি।

চোখ দুটোকে খোলা রাখার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু পাতাগুলো পাথরের মতো

ভারি হয়ে আসছে। শেষে বন্ধ হয়ে গেল চোখ। ঘুমের অন্ধকারে হারিয়ে গেল ও।

কয়েক ঘন্টা পর, একটা চিৎকারে ঘুম ভাঙলো ট্রেসির।

ষোলো

বিছানায় উঠে বসলো ট্রেসি। বুক ধড়ফড় করছে। বোঝার চেষ্টা করছে, কেন ঘুম ভাঙলো।

আবার ভেসে এলো চিৎকার। আর্তনাদের মতো।

ট্রেসি বুঝতে পারলো শব্দটা জানালার বাইরে থেকে ভেসে আসছে। বিছানা থেকে উঠলো ও। কিন্তু এ কি, পা তো রীতিমতো কাঁপছে। সে অবস্থাতেই টলতে টলতে জানালার পাশে এসে বাইরে তাকালো ও।

রাত অন্ধকার। গাছগুলো কালো, পাতা নেই। ডালগুলোয় চাবুক মারছে ঝোড়ো হাওয়া। দূরে, দৃষ্টি সীমানার নিচে, একটা বিশাল কড়াইয়ের মতো ফুটছে উত্তপ্ত সমুদ্র।

আবার ভেসে এলো আর্তনাদ।

আবার।

এবার আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলো ট্রেসি। পাথর গান গাইছে। নিশ্চয়

সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে সিরক্কো। আর প্রচণ্ড বেগে ঢুকছে পাথরের ফাটলের ভেতরে। তাই দুঃখের গানের মতো, কান্নার মতো, আর্তনাদের মতো বারবার শোনা যাচ্ছে ওই শব্দ। কিন্তু ট্রেসির মনে হলো ওটা পাথরের চিৎকার নয়, হাসানের বুকফাটা হাহাকার। ট্রেসির জন্যে কাঁদছে হাসান; আর প্রাণভিক্ষা চাইছে ওর কাছে।

ওই আর্তনাদ, ওই হাহাকার সহ্য করতে পাচ্ছে না ট্রেসি। দুহাতে কান ঢাকলো ও। তবু শব্দটা যাচ্ছে না।

দরজার দিকে পা বাড়ালো ট্রেসি। কিন্তু নিজের শারীরিক দুর্বলতায় অবাক হয়ে গেল। আর মানসিক অবসাদ তো আছেই।

অনেক কষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে সিঁড়িতে পৌঁছে ডিটেকটিভ পাওলো বাস্তার নাম ধরে ডাকলো ট্রেসি। একবার। দুইবার।

কোনো উত্তর এলো না।

টলতে টলতে কোনরকমে লিভিংরুমে পৌঁছুলো ট্রেসি। না, পাওলো নেই।

এক ঘর থেকে আরেক ঘর, এভাবে প্রতিটি ঘরে খুঁজলো ট্রেসি। কিন্তু কোথাও পাওলো নেই।

বাড়িতে ও একা।

দরজা খুলে বাইরে এলো ট্রেসি। না, সেখানেও কেউ নেই। শুধু কালো রাত, আর বিক্ষুব্ধ বাতাস।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে ঢুকে স্টাডি-রুমে এলো ও। পুলিস। পুলিস স্টেশনে টেলিফোন করে জানতে হবে ব্যাপার কি?

রিসিভার তুললো ট্রেসি। কিন্তু লাইন ঠাণ্ডা। কোনো শব্দ নেই। গা ছমছম করে উঠলো ট্রেসির।

আর সে মুহূর্তে নিবে গেল বাড়ির সবগুলো আলো।

।।ম। লিওনার্দো দ্য ভিনচি এয়ারপোর্টে দুঘন্টা ধরে সার্ডিনা পুলিস স্টেশনের

সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করছে ডিটেকটিভ উইলিয়াম। সিরক্কোর কারণে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আবার এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে উইলিয়াম বললো, 'আমার এখনি সার্ডিনায় যাওয়া দরকার। বিশ্বাস করো, এটা একজনের জীবন মরণের প্রশ্ন। যেভাবেই হোক একটা প্লেনের ব্যবস্থা করো।'

'সিনর, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আমার করার কিছু নেই। সার্ডিনার সঙ্গে এখন কোনো যোগাযোগ নেই। এয়ারপোর্টগুলো বন্ধ। বোটও যাচ্ছে না। সিরক্কো না থামা পর্যন্ত ওই দ্বীপে যাওয়ার কোনো পথ নেই।'

'সিরক্কো কখন থামবে?'

'অন্তত আরো বারো ঘন্টা পরে।' দেয়ালে ঝোলানো আবহাওয়ার বিশাল মানচিত্রটা ভালভাবে দেখে বললো ম্যানেজার।

তখন পৌঁছে কোনো লাভ নেই। তার আগেই মারা যাবে ট্রেসি মেয়ার। ভাবলো উইলিয়াম।

ফণা তুলে আছে আততায়ী আঁধার। এর ভেতরে লুকিয়ে আছে ওকে খুন করার জন্যে উন্মুখ শত্রু। এবং ট্রেসি এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে ওর জীবন এখন পুরোপুরি শত্রুর দয়ার ওপর নির্ভর করছে। ডিটেকটিভ পাওলো ওকে ভুলিয়ে এখানে এনেছে খুন করার জন্যে। পাওলো হাসানের ভাড়াটে। পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফোন করার অছিলায় হাসানকে জানিয়েছে, '...আমরা এখন ভিলায়।...'

বাঁচার একমাত্র উপায় এখান থেকে পালানো। সেটা বোঝে ট্রেসি। কিন্তু পালানোর কোন শক্তি ওর গায়ে নেই। চোখ খোলা রাখতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে। ভারি হয়ে আসছে হাত পা। এর কারণটাও ধরতে পেরেছে ট্রেসি। কফির মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছে পাওলো।

ভাগ্যে যাই থাক, মরার আগে হলেও, নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলো ও।

ঘুরে, মন্থর পায়ে আঁধারে ঢাকা রান্নাঘরের দিকে এগোতে লাগলো ট্রেসি।

রান্নাঘরে পৌঁছে একটা ক্যাবিনেট খুলে হাতড়ে হাতড়ে একটা ভিনেগারের বোতল বের করলো ও, গ্লাসে কিছুটা ঢেলে নিয়ে পানি মিশিয়ে নাক বন্ধ করে সবটুকু খেয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে পেট ছিঁড়ে উগড়ে উঠলো বমির দলা। বেসিনে মাথা নামিয়ে হড়হড় করে বমি করলো টেসি।

কিছুটা ভালো লাগছে এখন। কিন্তু দুর্বলতা আগের মতোই আছে। মাথা কাজ করতে অস্বীকার করছে। যেন গোটা স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যুর আঁধারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

'না,' কে যেন চিৎকার করে উঠলো টেসির ভেতর, 'তুমি এভাবে মরতে পারো না। তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।'

কার গলা?

হ্যাঁ। মনে পড়ছে ,বাশেভিসের। ওর প্রিয় পুরুষ বাশেভিসের অপরাজিত গলা।

সহজাত প্রবৃত্তির ওপর ভর করে পা টেনে টেনে হলঘরে রাখা বাশেভিসের পোর্টেটের নিচে দাঁড়ালো টেসি।

বাইরে মরুবাতাসের কান্না। কখনো আর্তনাদ। কখনো বিদ্রূপ। কখনো সাবধানবাণী। আর অন্ধকারে একা পরিত্যক্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে ও। সামনে [illegible]। কি করবে ও? পালিয়ে যাবে? নাকি এখানে থেকে লড়বে? দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে বাছতে হবে। আর তখনি ও উত্তর পেলো, কি করতে হবে [illegible]।

সিঁড়ি ধরে ধীর ধীরে উপরে উঠলো টেসি।

[illegible] মুহূর্তে নিচে, হলঘরে শব্দ হলো খস্খস্। কে যেন হাঁটছে [illegible]।

পাথরের মতো জমে গেল টেসি। এ বাড়িতে ও আর একা নয়।

*

লিওনার্দো দ্যা ভিনচি এয়ারপোর্টের যে এলাকায় মাল ওঠা-নামা করে, সেখানে একটা হেলিকপ্টারকে নামতে দেখে দৌড়ে ছুটে এলো ডিটেকটিভ উইলিয়াম।

পাইলট দরজা খুলে নিচে নামার আগেই শুনতে পেলো, 'সিনর, আমাকে সার্ডিনায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'ব্যাপার কি?' ভ্রু কুচকে জানতে চাইলো পাইলট, 'আমি এইমাত্র ওখানে একজনকে রেখে এলাম। সাংঘাতিক সিরক্কো চলছে।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?'

'তিনগুণ ভাড়া লাগবে।'

'দেবো।'

হেলিকপ্টারে উঠলো উইলিয়াম।

আকাশে ওড়ার পর ও জানতে চাইলো, 'পাইলট, যাকে তুমি সার্ডিনায় নামিয়ে এলে তার নাম জানো।'

'হ্যাঁ। হাসান জহির।'

আঁধার এখন ট্রেসির বন্ধু। ওর কালো বুকে খুনীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারছে। ডেভিড মেয়ারের বেডরুমের দিকে পা বাড়ালো ট্রেসি।

আঁধারের ভেতর কি যেন একটা লাফিয়ে উঠলো। চিৎকার করতে যাচ্ছিলো ট্রেসি, কিন্তু তার আগে দেখে, ওটা জানালার বাইরে ঝাপটা খাওয়া গাছের ডালের ছায়া।

খুনীকে দেরি করাও। বললো ওর মন। কিন্তু কিভাবে?

ভাবো। এ অবস্থায় পড়লে বাশেভিস কি করতো?

বেডরুমে ঢুকে চাবির গোছা নিয়ে বেরিয়ে এলো ট্রেসি।

প্রথমে বেডরুমের দরজা, তারপর একে একে ওপরতলার সবগুলো দরজা

ধ্ব করলো ও।

হঠাৎ নিচে জ্বলে উঠলো ফ্লাশলাইটের শিখা। উঠছে। ওপরে উঠছে।

হাসান আসছে ওর কাছে।

টাওয়ার রুমে যাবার সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠতে লাগলো ট্রেসি। কিন্তু মাঝপথে হাঁটু ভেঙে পড়তে চাইলো ওর। বসে পড়লো ও। হামাগুড়ি দিয়ে বাকি পথ এগোলো।

দরজা খুলে টাওয়ার রুমে ঢুকলো ট্রেসি।

সামনে এগোতে যাবে, এমন সময় শুনলো, 'দরজা। দরজা বন্ধ করো।'

দরজা বন্ধ করে একটার পর একটা আসবাবপত্র চাপালো ট্রেসি। টেবিল। চেয়ার। আবার টেবিল।

নিচে, ভাঙার শব্দ হলো। একটু পর আবার। আবার। দরজা ভাঙছে।

ফ্রেঞ্চ ডোরে পৌঁছে বাইরে তাকালো ট্রেসি। এখনো চলছে পাগলা হাওয়ার বিলাপ। ব্যালকনির ওপারে সমুদ্র। এখান থেকে পালাবার পথ নেই। চারদিকে তাকালো ও। আত্মরক্ষার জন্যে একটা অস্ত্র দরকার। কিন্তু কোথাও নেই অস্ত্র।

অন্ধকারে, একা একা দাঁড়িয়ে, ওর খুনীর আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলো ট্রেসি।

এমন সময় ওর নাকে এলো ধোঁয়ার গন্ধ।

হেলিকপ্টার থেকে সার্ডিনা উপকূল দেখতে পেলো উইলিয়াম। মেঘের মতো পাক খাচ্ছে লাল বালুর ঘূর্ণি।

'আগের চেয়েও অবস্থা খারাপ। সম্ভবত নামা যাবে না,' চিৎকার করে বললো পাইলট।

'তোমাকে পারতেই হবে। পোর্টো কারভোর দিকে যাও।'

'কিন্তু ওটা তো পাহাড়ের চূড়োয়।'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই। পারবে?'

'সম্ভাবনা সত্তর বনাম তিরিশ।'

'আমাদের পাল্লা কোন দিকে?'

'বিপক্ষে।'

দরজার কবাটের নিচ দিয়ে বাঁক খেয়ে ভেতরে ঢুকছে ধোঁয়া। বাইরের মত্ত হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে যোগ হলো আর একটি নতুন শব্দ, আগুনের শিখার ক্রুদ্ধ হাসি।

দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল ধোঁয়ায়। হলুদ। কটু।

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো ট্রেসির।

ও দেখতে পাচ্ছে, আগুনের লকলকে শিখা ফুটো করে ফেলছে কবাট। উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে ওর শরীরে।

সে উত্তাপ আর নিজের ক্রোধ মিলেমিশে ট্রেসিকে দিলো চলার শক্তি। নাক চোখ বন্ধ করে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে ফ্রেঞ্চডোরের দিকে এগিয়ে চললো ও।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ব্যালকনিতে নামলো ট্রেসি।

আর দরজা খোলার সাথে সাথে হলওয়ে থেকে আগুনের শিখাগুলো ঘরে ঢুকে দেয়াল চাটতে আরম্ভ করলো।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস টানলো ট্রেসি।

কিন্তু নিচে তাকাতেই সব আশা উবে গেল। ওর নিচে, অতল গহ্বর। তার ওপর ব্যালকনি ভাসছে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো। না, পালাবার কোনো পথ নেই।

ওপরে, স্লেটের ঢালু ছাদ। কোনভাবে ছাদের ওপর উঠতে পারলে, এবং বাড়ির ওদিকে যেতে পারলে, পালানো যেতো। ওদিকে এখনো আগুন লাগেনি।

দুপায়ের ভরে যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে হাত তুললো ট্রেসি। কিন্তু হাত পৌঁছুলো না ছাদে। ছাদের ধার তখনো অনেক ওপরে।

আগুনের লেলিহান শিখা ঘর থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে ওর দিকে।

বাঁচার এখন একটাই পথ আছে। সে পথে এগোলো ট্রেসি।

দ্রুতগতিতে আগুনে জ্বলন্ত, ধোঁয়ায় ভরা ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার বের করে এনে ব্যালকনিতে রাখলো।

আস্তে আস্তে চেয়ারে উঠে ছাদে হাত বাড়ালো ট্রেসি। হ্যাঁ। ছাদের নাগাল পাওয়া গেছে। কিন্তু আঙুলগুলো ধরার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ধের মতো ছাদ হাতড়াতে আরম্ভ করলো ও।

ওদিকে ঘরের পর্দা, বই, কার্পেট, আসবাবপত্র পুড়িয়ে ফেলে ব্যালকনিতে মাথা বাড়িয়েছে আগুনের উন্মত্ত শিখা।

হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ একটা খাঁজে আঙুল আটকে গেল ট্রেসির।

সেই খাঁজ আঁকড়ে ধরে আস্তে আস্তে নিজেকে ওপরে ওঠাতে লাগলো ও। পায়ের নিচ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করলো চেয়ার।

পড়ে গেল চেয়ার। শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে শক্ত করে খাঁজ আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে লাগলো ট্রেসি।

মনে পড়ছে···রশি ধরে বাশেভিস উঠছে ক্যাম্পের দেয়ালের মাথায়। উঠছে···উঠছে ট্রেসি। চমক ভাঙতে হঠাৎ ও দেখলো, ঢালু ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। হাঁসফাঁস করছে বাতাসের জন্যে।

বাঁচার জন্যে নিজের সমস্ত ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করলো ট্রেসি।

ঢালু ছাদ বুক দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলো ও, হাত আর পায়ের ভারসাম্য [illegible] [illegible] সাপের মতো উঠতে লাগলো ওপরে।

[illegible] [illegible] করছে না ট্রেসি। মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। একবার ফসকালেই

পড়ে যাবে নিচে, অতল গহ্বরে।

ছাদের চূড়ায় পৌঁছুলো ট্রেসি। দম নেবার জন্যে থামলো। ওর ছেড়ে আসা ব্যালকনি তখন জ্বলছে আগুনে। ফেরার কোনো পথ নেই।

বাড়ির ওপাশে, নিচে, দেখা যাচ্ছে অতিথিদের থাকার ঘরগুলোর একটা ব্যালকনি। এখন পর্যন্ত ওখানে আগুনের শিখা পৌঁছেনি। কিন্তু ট্রেসি বুঝতে পারছে না, কেমন করে ওখানে নামবে ও। ছাদ বেশ ঢালু। বাতাসের বেগও তেমন কমেনি।

ছাদের চূড়ায় বসে আছে ট্রেসি। ভয়ে জমে গেছে শরীর। নামার চেষ্টাও করছে না ও।

হঠাৎ, সপ্তম আশ্চর্যের মতো, অতিথি-ব্যালকনিতে ফুটে উঠলো একজন মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব। রিচার্ড।

ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে ডাকলো রিচার্ড, 'ট্রেসি, মাই সুইট সিস্টার, বসে বসে ভাবছো কেন? নামো। নামো। তুমি পারবে।'

আকস্মাৎ নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পেলো ট্রেসি। বাঁচতে হবে। হবে।

'কিন্তু ধীরে ধীরে। শরীর ছেড়ে দাও।' উপদেশ দিচ্ছে রিচার্ড।

শরীর ছেড়ে দিলো ট্রেসি।...

এক মিনিট। দুই মিনিট।...

'নিচে তাকাবে না। চোখ বন্ধ করো। আমি তোমাকে ধরবো।'

তিন মিনিট। চার মিনিট।...

'হ্যাঁ। লাফ দাও।'

শূন্যে নিজেকে ছুঁড়ে মারলো ট্রেসি।...

শক্ত করে লুফে নিয়ে ব্যালকনিতে ওকে দাঁড় করলো রিচার্ড।

বুক ভরে দম নিলো ট্রেসি। কিন্তু চোখ আগের মতোই বন্ধ।

'অপূর্ব' বললো রিচার্ড। আর তখনি ট্রেসি ওর মাথায় ছোঁয়া পেলো রিভলভার

মাযলের।

ঝড়ের ঝাপটা বাঁচিয়ে, অনেকটা নিচে নেমে, গাছের মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার ওড়াচ্ছে পাইলট। ওই উচ্চতায়ও বাতাস অশান্ত। হঠাৎ পাইলটের চোখে পড়লো পোর্টো কারভো পাহাড়চূড়ো। একই সময়ে উইলিয়ামও দেখতে পেয়েছে। 'ওই তো,' চিৎকার করে বললো ও, 'আমি সার্ডিনা ভিলা দেখতে পাচ্ছি।' কিন্তু তারপর উইলিয়াম যা দেখলো তাতে আঁতকে উঠেছে ওর হৃৎপিণ্ড। আগুনে জ্বলছে ভিলা।

ট্রেসির লাল বিরনের দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড। চোখ দুটো ভরে আছে ব্যথায়।

'ট্রেসি, মাই ডার্লিং, চোখ খোলো। খুলে ফেলো লাল রিবন। দেখো, আমি আজ মহানায়ক। আজ কোনো ক্যামেরাম্যান নেই। কোনো দর্শক নেই। প্রকৃতি আজ স্লাফ ফিল্ম। নায়িকা তুমি, নায়ক আমি। তোমার সব কাপড় খুলে ফেলো। নগ্ন হও।'

চোখ বন্ধ করে আছে ট্রেসি। রিচার্ডের কোনো কথা কানে ঢুকছে না ওর। মরার আগে হলেও সত্য জেনে গেছে ও। হাসান নিষ্পাপ, নির্দোষ। হাসান, ওর প্রেমিক। কিন্তু মরার আগে দেখা হবে না ওর সঙ্গে?

মরার আগে এখন একটাই আফসোস ট্রেসির। হাসানের কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো না। বলে যেতে পারলো না, 'হাসান, আমি কখনোই বিশ্বাস করিনি তুমি খুনী।'

'চোখ খোলো, ট্রেসি। নগ্ন হও।' এক হাতে রিভলভারের নল ধরে অন্য হাতে ট্রেসির লাল রিবনের গিট খুলতে খুলতে চিৎকার করে উঠলো রিচার্ড।

'না।' মরতে প্রস্তুত ট্রেসি। অনেক গ্লানি জমেছে ওর। হাসানের সাথে

অনেক লুকোচুরি খেলেছে ও।

'রিচার্ড। তোমার রিভলভার ফেলে দাও।' হাসানের গলা।

সিরক্কো গর্জন ছাপিয়ে, হেলিকপ্টারের শব্দ ছাপিয়ে সিংহের মতো গজরালো হাসান।

ঘোর কেটে গেল ট্রেসির। চোখ খুলে নিচে তাকালো ও।

নিচে, লনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে হাসান। সঙ্গে পুলিস চীফ আলবার্তো জিয়াভান্নি। একদল পুলিস। সবার হাতে রাইফেল।

'রিচার্ড, তোমার খেলা শেষ। ট্রেসিকে ছাড়ো।' আবার হুঙ্কার দিলো হাসান।

ট্রেসির গলার লাল রিবনের গিট ধরে হেঁচকা টান মারলো রিচার্ড। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়লো ট্রেসি।

গর্জে উঠলো হাসানের হাতের রাইফেল। একবার। দুইবার।...

পড়ে যেতে যেতে ট্রেসি শুনলো আলবার্তো জিয়াভান্নি বলছে, 'আপনার হাতের তাক অব্যর্থ মি. হাসান।'

সতেরো

ঘাসের ওপর, হাসানের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠলো ট্রেসি।

'হাসান, আমার হাসান। আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার সাথে অনেক লুকোচুরি খেলেছি।'

একটা নতুন লাল রিবন ট্রেসির গলায় পরাতে পরাতে হাসান ডাকলো, 'ট্রেসি, চোখ খোলো। দেখো, সিরক্কো আর নেই। শান্ত হয়ে আছে নিসর্গ। শুধু তোমার প্রিয় সার্ডিনা ভিলা নেই। পুড়ে গেছে রিচার্ডের আগুনে।'

'তাই যেন হয়, হাসান। তাই যেন হয়। পুড়ে ছারখার হয়ে যাক আমার প্রিয় ভিলা। ওখানেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল তোমার ওপর।'

'তাহলে কোথায় আমরা মধুচন্দ্রমা করবো?'

'কেন, বাংলাদেশে।'

'তুমি যাবে?'

'আমি যাবো। আমি যাবো মরিয়মের দেশে। যেখানে হারিয়েছো তুমি তোমার লাল রিবন। তোমার ভালবাসা।'

'কিন্তু কিভাবে যাবে? সেখানে শুধু দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য, মহামারী।'

'আমার পিতৃপুরুষ জন্মেছেন মহামারীর মধ্যে। কিন্তু তিনিই আবিষ্কার করেছেন মহামারীর ওষুধ। আমি সেই রক্তধারার শেষ বংশধর। আমি মহামারীকে ভয় পাই না...'

ট্রেসি!'

'হ্যাঁ, হাসান। আমি শুধু শুধু মধুচন্দ্রমায় বাংলাদেশে যাবো না। আমি ওখানে ধারণ করবো আমার অনাগত সন্তানদের বীজ। ওরাই একদিন বাংলাদেশকে মুক্ত করবে মহামারীর অভিশাপ থেকে। আমি চুরি করে তোমার লাল ফাইল পড়েছি। আমি জানি, আমার সন্তানরা তা পারবে। চলো, তাড়াতাড়ি যাই বাংলাদেশে। তোমার রক্তধারায় মিশুক বাশেভিসের রক্তধারা।'

'ট্রেসি, চোখ খোলো, তাকাও আমার দিকে। দেখো তো, আমি তোমাকে ভালবাসি কি না?'

চোখ না খুলে, হাসানকে আরো কাছে টেনে ট্রেসি বললো, 'আমি দেখেছি, অনেকবার দেখেছি। আমিই তোমার প্রেম। অনন্ত আশা।'

ঃ শেষ ঃ